ফাঁসি আর ফাঁসুড়ে

ফাঁসি আর ফাঁসুড়ে

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা
অনূদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর
১৯৫৫

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

মা স্বর্গীয়া শোভনা চৌধুরী
এবং
বাবা স্বর্গীয় অমূল্যকুমার চৌধুরীর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

সাম্প্রতিক ফাঁসির খবরে উদ্যোগী হলাম লিখতে দু'কলম। তুলে ধরতে মহারাজ নন্দকুমার সহ নানা ফাঁসির প্রেক্ষাপট স্বল্পপরিসরে।

বিস্মৃত বিপ্লবী—যাঁরা ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছিলেন—তাঁদেরও স্মরণ করার চেষ্টা আশাকরি সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কিছুটা হলেও উৎসাহিত করবে। নিজের পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব—যদি তাঁরা আরও আগ্রহী হন ঐতিহাসিক ফাঁসির কাহিনীর প্রেক্ষাপট জানতে। তাহলে পর্দার-পিছনের অনেক কাহিনীই হয়তো উঠে আসবে তাঁদের নজরে। যা-হয়তো প্রচারের আড়ালেই রয়ে গিয়েছে।

সেই অজানা কাহিনী পড়লে সাম্প্রতিক হইচই মনে হবে, বর্তমানকালের ফাঁসি নিয়ে বাহুল্য হচ্ছে।

সে যা হোক, পাঠক-পাঠিকাদের উপর রইল বিতর্কের ভার। এই বইটি লিখতে আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছেন দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার সুধাংশুশেখর দে। আমাকে লেখার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন সবে আইনপেশায় যুক্ত হওয়া অন্তরা নস্কর। দে'জ-এর কর্মীবৃন্দকে জানালাম আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। সকলকেই জানাই আমার শুভেচ্ছা।

চিন্ময় চৌধুরী

এক

প্রথমদিকে যেসব বিশেষ ঘটনাবলি সংবাদ-মাধ্যমে প্রাধান্য পেয়েছে—তার মধ্যে বোধহয় ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসি ও নাটা মল্লিকের রশির টান জনমানসে শিশুমনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। তা যদি না হবে তবে হঠাৎ দেশের নানাপ্রান্তে একাধিক শিশু ফাঁসি-ফাঁসি খেলায় মত্ত হয়ে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ বিসর্জন দিল কেন? এই শিশুগুলির মৃত্যুর জন্য দায়ী তাহলে কে? এই প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই কী এসে পড়ে না?

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে অদ্যাবধি প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে ধনঞ্জয়কে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারায় প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই আদেশ সর্বোচ্চ-আদালতও বহাল রেখেছিলেন। শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতিও ধনঞ্জয়ের প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন। হঠাৎ করে সংবাদ-মাধ্যমের মানবতাবোধ এত তীব্র হয়ে উঠল কেন—তাও একটি চমকপ্রদ ব্যাপার। ফাঁসির দণ্ড বহাল থাকা নিয়ে যৌক্তিকতার প্রশ্ন থাকতেই পারে।

প্রাণদণ্ড থাকবে কিনা—তা নিয়ে স্বাধীন ভারতবাসী সোচ্চার হতেই পারেন। তাদের আওয়াজ পৌঁছতে পারে আইন-কমিশনে, আইন-আদালতে উচ্চ-প্রশাসনিক স্তরে ও পার্লামেন্টে। বিচারালয় থেকে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা পাওয়ার পর যুগ যুগ ধরে কত দেশ হিতৈষী কত নামীদামি মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে—ফাঁসিতে—তাদের জন্য দেশের লোকের চোখের জল পড়েছিল কিনা—তা জানা নেই। এমনকি স্বাধীনতা-আন্দোলনে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে যাঁরা হাসতে-হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নিয়েছিলেন তাঁদের কথা কেউ জানতে চেয়েছেন? কতিপয় দেশবাসীকে বাদ দিলে কতজন জানেন—ক্ষুদিরাম, সত্যেন বসু, রামকৃষ্ণ রায়, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, কানাইলাল দত্ত, মাস্টারদা সূর্য সেন, মদনলাল ধিংরা, দীনেশ গুপ্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, ভবানী ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচাঁদ সাহা, সুশীল লাহিড়ী, বসন্ত

বিশ্বাস, ভগৎ সিং, অবোধ বিহারী, হনুমন্ত সহায়, বাল মুকুন্দ, রামপ্রসাদ আসফাকউল্লা, কৃষ্ণ চৌধুরী, হীরেন্দ্র চক্রবর্তী, গোপীনাথ সাহারা কোন জেলে কোন সময়, কত তারিখে ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন—সেসব ঘটনার সাক্ষী কে ছিল, ফাঁসুড়েরাই বা কারা ছিল?

দিনকাল বদলায়—এখনকার মতো সংবাদমাধ্যম অত জোরালো ছিল না। কিংবা মানুষের রোষ প্রকাশ করার মাধ্যম ছিল না। কিন্তু ফাঁসুড়ে কে হবেন, কীভাবে ফাঁসের দড়ি তৈরি হবে। কোন দেশ থেকেই বা তা আনানো হবে, দড়ির প্রকৃতি কেমন হবে, কত জোরেই বা তাতে টান পড়বে—সেসব নিয়ে তখনকার লোকের অত মাথাব্যথা ছিল না বোধহয়, প্রয়োজনও ছিল না। এখানেই শেষ নয়। ফাঁসুড়েকে ইলেকট্রনিক-মিডিয়ায় দেখানো—তার মতামত প্রকাশ করা, তার নানা কৃতিত্ব দেখানো, শরীরের ওজন, মানসিক গতি প্রকৃতি ফাঁসুড়ের গলায় গান শোনানো—কি না হয়েছে—ধনঞ্জয়ের ফাঁসি দেওয়ার আগে! দেখে মনে হয় ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বে এটাই প্রথম ফাঁসির ঘটনা।

বাস্তবে মানতেই হবে—ধনঞ্জয়ের ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগে, অন্তত নাটাকে রঙ্গমঞ্চের এক গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতা করে দিয়ে গেল। নাটার উপাধি যে মল্লিক—একথাও কি অধিকাংশ লোক জানতেন? ফাঁসুড়ে নাটা মল্লিককে সভামঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিতে হবে ফাঁসি নিয়ে—ব্যাপারটা কি সে জানত! সে কী ভেবেছিল 'নাটা' 'নাটাবাবু' হয়ে যাবে। ফাঁসির দড়িতে টান মারার পর তার শারীরিক অবস্থা কেমন হয়েছিল—তাও ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। তার বংশ পরিচয় তার সরকারের উপর ক্ষোভ—নানা কায়দায় চাপ সৃষ্টি—সবই যেন খবর—কোন সংবাদ মাধ্যম কত দ্রুত নাটাকে ধরে তার বক্তব্য প্রকাশ করবেন—এটা যেন একটা বিষয় হয়েছিল। ছবি ছাপা হচ্ছিল ফাঁসির দড়ি কীভাবে ঝোলানো হয়—মঞ্চের চেহারাই বা কীরকমের, ধনঞ্জয় সেই দড়িতে কীভাবে ঝুলবে এসবই।

এসবের ফলে শিশুমনে প্রতিক্রিয়া হয়েছে খুবই বিরূপ। একাধিক শিশু শুরু করল ফাঁসি-ফাঁসি খেলা, সংবাদ-মাধ্যমের বাড়াবাড়িতে একাধিক নিষ্পাপ শিশু ফাঁসি-ফাঁসি খেলতে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। কিন্তু এদের জন্য মানবতাবোধ দেখা গেল না।

ধনঞ্জয়ের হল প্রাণদণ্ড আর ফাঁসুড়ে নাটামল্লিক হল 'নাটাবাবু'। ধনঞ্জয়ের পরিবারের হল পতন আর নাটাবাবুর উত্থান। নাটা মল্লিকই বলেছিল—তার বাপ-ঠাকুর্দা ছিল ফাঁসুড়ে। তাঁরা নাকি মহান-নেতা সূর্য সেনের ফাঁসির দড়ি টেনেছিলেন। টানতেই পারে, সেই কাহিনী বলে কৃতিত্ব দেখানো অন্তত স্বাধীন

ভারতে উচিত নয়। ধনঞ্জয়ের ফাঁসির কয়েক দিন্ পরে সংবাদ-মাধ্যমে দেখা গেল মায় নাটাবাবু রক্তদান-শিবির উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন একটি জেলা-শহরে। এটা কি সুষ্ঠু সংবাদ—তা বিচারের ভার সাধারণ মানুষের উপর।

আইনগত প্রশ্ন উঠতেই পারে—ফাঁসির দণ্ড বহাল থাকা উচিত কিনা। কিন্তু যখন আইনে প্রাণদণ্ডের বিধান রয়েছে, তখন অভিযোগের গভীরতা পরিমাপ করে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া তো বেআইনি নয়। তর্কের খাতিরে অবশ্য বলতে পারা যায় ধনঞ্জয়ের মতো অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দিলেই অপরাধীরা সব সাবধান হয়ে যাবে, সমাজে আর হত্যাপরাধ হবে না। ভয়ে সিঁটকে থাকবে—তা কখনওই বাস্তবে সত্য হতে পারে না। আবার প্রাণদণ্ডের আদেশ না দিলেই মানবতা বোধের অগ্রগতি হল—এই ধারণাও ভুল।

কেউ ভাবলেন না ধনঞ্জয় এমন কোনও মহাপুরুষ নয়, যাকে নিয়ে এত মাতোয়ারা হওয়ার কোনও কারণ ছিল। ফাঁসুড়েকে নিয়ে এত মাতামাতি—তার ফাঁসের দড়িতে টানের কাহিনী এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরার কি কোনও প্রয়োজন ছিল?

এই মাতামাতির জন্য এতগুলো শিশুর প্রাণ চলে গেল! আরও কত যাবে কে জানে! কী জবাবই বা দেবো আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মকে?

স্বাধীন ভারতেও একাধিক দুষ্কৃতীকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে সব ফাঁসির কাহিনী না জানলেও নাথুরাম গডসের কথা, যে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছিল—তার ফাঁসির কথা অনেকেই জানেন, জানেন—প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকারী বিয়ন্ত সিংয়ের ফাঁসির কথা। জানেন-রঙ্গা-বিল্লার ফাঁসির কথা। এরপরেও একাধিক দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে হত্যাপরাধ প্রমাণিত হওয়ায়—এবং সেগুলি 'রেয়ারেস্ট অব্ দি রেয়ার কেসেস' হওয়ায় ফাঁসি হয়েছে আসামিদের। ধনঞ্জয়ের ফাঁসি নিয়ে যত হইচই হল এরকম হইচই ইতিপূর্বে সম্ভবত হয়নি। আর ভবিষ্যতেও হবে কিনা তা আমরা জোর গলায় বলতে পারি না।

সংবাদপত্র এবং সংবাদ-মাধ্যমগুলি কি বলতে পারবে ভারতবর্ষে যাঁরা ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিয়েছেন, কারা ছিলেন ফাঁসুড়ে—সেসব ঘটনায়? ফাঁসুড়ের কাজ—ফাঁসির দড়িতে টান দেওয়া। সেজন্য তারা সরকার থেকে মজুরিও পায়। তা নিয়ে বাড়াবাড়ি সংবাদের প্রতিফলন সমাজে পড়তে বাধ্য।

সংবাদপত্রে প্রকাশ—ধনঞ্জয়ের আদলে দেবী দুর্গার সামনে অসুরের আকৃতি হবে। নাটাবাবুকে মহাদেব না করলেও তির ধনুক দিয়ে কার্তিকবাবুর চরিত্রে দাঁড়

করানো যেতে পারে। তির ধনুকের বদলে ফাঁসির-দড়ি ধরালেই বা মন্দ কী? অসুররূপী ধনঞ্জয়ের গলায় পরিয়ে টান দিলেই তো সমাধান হয়ে যায়।

দায়রা বিচারকের দেওয়া ফাঁসির দণ্ড মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বহাল থাকাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর, শেষপর্যন্ত মাননীয় রাষ্ট্রপতিও ধনঞ্জয়কে মার্জনা করে ফাঁসির আদেশ রদ করতে পারেননি। সেটাও একটা খবর হতে পারে। ফাঁসি কার্যকর হয়ে গেল সেটাও একটা খবর হতে পারে। ভুল বললে শ্রদ্ধেয় সাংবাদিকরা লেখককে মার্জনা করবেন।

ধনঞ্জয় জেলের সেলে কতক্ষণ ঘুমাচ্ছে, কতক্ষণ জেগে আছে—কখন সে রেডিও শুনছে, কোন অনুষ্ঠান শুনছে, রেডিও সেটটাই বা কী ধরনের—সে কখন কী কথা বলছে—কী সংবাদে তার কীরকম মানসিকতা—কোন ম্যাজিস্ট্রেট ফাঁসির মঞ্চের কাছে ফাঁসির কাজ পরিচালনা করবেন—তাঁর মনের অবস্থা কেমন হতে পারে—এসব নিয়ে সম্যক আলোচনাও পরিবেশিত হয়েছে। নির্দিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট যদি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন—বা অসুস্থ হয়ে পড়েন তার পরিবর্ত কে হবেন —এসব কি সংবাদিকতা? না, এতে চমক ছাড়া সমাজের কোনও কাজ হবে সেটা সংবাদজগতের বিজ্ঞব্যক্তিরাই সবথেকে ভালো বলতে পারবেন। দোষ না নিলে বলা যেতে পারে, বর্তমানে একটা কথা খুব শোনা যায়, সাধারণ মানুষ কোনটা খাবেন। সেদিক থেকে বলা যায়—ধনঞ্জয়ের ফাঁসির কাহিনী ও ফাঁসুড়ে নাটা মল্লিকের নাটাবাবু হিসাবে বক্তব্য সাধারণ মানুষ ভালোই খেয়েছেন।

সঙ্গে ছিল নাটার ছেলে বা নাতির চাকরির কী হবে—তার কতগুলি আবেদন-নিবেদন সরকার ইতিপূর্বে শুনেছেন, ভবিষ্যতে শুনবে কিনা, আই. জি. (কারাদপ্তর) তার দাবি বা আবেদন নিয়ে কী কী পদক্ষেপ নেবেন তাও সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু, কেউ ভাবলেন না শিশুমনের কথা। ফাঁসি ব্যাপারটা তো নতুন নয়—কই এমন ফলাও করে ইতিপূর্বে কখনওই কি পরিবেশিত বা প্রকাশিত হয়েছে। ফাঁসি ব্যাপারটা নিয়ে যখন এত আলোড়ন, তখনই ভাবছিলাম—ফাঁসি নিয়েই যদি লিখতে হয়, তবে শুরু করব মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির ইতিহাস দিয়ে–অবশ্য এই ফাঁসি সম্বন্ধে ইতিহাস ঘেঁটে যতটুকু সংগ্রহ করা গেছে—সেটুকুকে কেন্দ্র করে। শুনেছি একদা নন্দকুমারের ফাঁসি নিয়ে একটি বই লেখা হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বইখানি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

ইংরেজ আমলে বিচারকের রায়ে ফাঁসি হত। মুসলিম আমলে ছিল কোতল করার আদেশ। সেই আদেশ দিতেন কাজী বা নবাব। ইংরেজ আমলে নন্দকুমারের ফাঁসির আগে ও পরে কত বিচিত্র ঘটনায় প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে—সেই

বিষয়েও কিছু কাহিনীর উল্লেখ করা যাবে।

ইংরেজ আমলে বেশিরভাগ অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়া হত জনবহুল স্থানে। জনগণকে ভয় পাইয়ে দেওয়াই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। এমনকি বড় নৌকার উপর ফাঁসির মঞ্চ বানিয়ে বা গাধাবোটের উপরও ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা হয়েছে।

মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তদানীন্তন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের ফাঁসির আদেশ কিন্তু জনরোষ সৃষ্টি করেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছিল। বহু হিন্দু প্রতিবাদমুখর হয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আদেশের বিরুদ্ধে তখনকার পরিবেশে সাধারণ মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠতে পারেননি। যতদূর জানা যায় হেস্টিংসের ষড়যন্ত্রে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইলিজা ইম্পের আদেশে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল। স্যার চেম্বারও ছিলেন স্যার ইম্পের সহযোগী। এখনকার দিনে দু'জন বিচারপতির বেঞ্চকে বলা হয় 'ডিভিশন-বেঞ্চ'। এখনকার হাইকোর্ট বাড়িটি একটু ছোট আকারে ছিল তখনকার কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট। আর কলকাতা হাইকোর্ট ছিল ফোর্ট উইলিয়ামে। কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবীরা ছিলেন সব অ্যাটর্নি।

এটা সবাই জানেন, ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার লক্ষ্যে এসেছিল। বাণিজ্য করে তাদের যে রাজলক্ষ্মী লাভ হবে তা প্রথম অবস্থায় বোধহয় তারা স্বপ্নেও ভাবেননি। প্রথমে তাঁদের অনেক অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছিল তদানীন্তন নবাব ও ফৌজদারদের হাতে। সবথেকে বেশি অত্যাচার হয়েছিল—বাংলার মোগল ভাইসরয় নবাব উলমুলুক শায়েস্তা খাঁ বাহাদুর তাঁর পর নবাব মুর্শিদকুলিখাঁ দেওয়ান ও সুবাদারের যুক্তপদ লাভ করে ইংরেজ বণিকদের ভালোরকম উৎপীড়ন করেছিলেন।

ভারতের একাধিক স্থানে ইংরেজদের কুঠি ছিল, বিশেষ করে বড় বড় কুঠি ছিল—মাদ্রাজ, বোম্বাই সুরাট, বালেশ্বর, পাটনা এবং বাংলার মালদহ, কাশিমবাজার, কলকাতা প্রভৃতি স্থানে। এবং এই সব কুঠিতে অনেক ইংরেজ কর্মচারী কাজ করতেন। এদের মধ্যে অনেকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি অপরাধ করতেন। মুশকিল ছিল এইসব কর্মচারীর শাসন কর্তা ছিল কোম্পানি বাহাদুর। তখন এই ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ডের রাজার সনদপ্রাপ্ত বণিক সমিতি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। বিচারের ক্ষেত্রে দেখা দিল মহা সমস্যা। এই জন্য ভারতে ইংরেজদের বিচারের জন্য কোম্পানির ডাইরেক্টররা বিলাতের পার্লামেন্টের কাছে তিনবার সনদ প্রার্থনা করেন—যথাক্রমে ১৬৬১, ১৬৮৩ ও ১৬৮৬ সালে। এই প্রার্থনা বলে ভারতে আদালত স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে কলকাতায়

স্থাপিত হয় মেয়রস্ কোর্ট 'কোর্ট অব আয়ার অ্যান্ড টারমিনার' 'কোর্ট অব রিকোয়েস্টস' বিভিন্ন আদালত।

লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক কোম্পানির প্রশাসন হস্তগত হওয়া পর্যন্ত বিচার-ব্যবস্থা এইসব আদালতের মাধ্যমেই চলছিল। তখন পর্যন্ত আইন-আদালত, নবাব-নাজিমের খাসে থাকলেও ইংরেজদের খানিকটা আদালতের উপর ন্যস্ত ছিল। যেভাবে আইন-আদালত চলছিল—তাতে নানাধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। শেষপর্যন্ত ১৭৭৩ সালের চার্টারে সুপ্রিম কোর্টের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস হলেন বাংলা, বিহার ও ওড়িশ্যার প্রথম গভর্নর জেনারেল বা লাটসাহেব। তাঁর অধীনে একটি মন্ত্রিসভাও গঠন করা হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও তাঁর সহযোগী বিচারপতিদের নিয়ে আসা হয় বিলাত থেকে—ভারতে বিচারকাজ পরিচালনার জন্য। শোনা যায়, সুপ্রিম কোর্ট তৈরি হয়ে ছিল "To protect natives from oppressions and to give India benefits to English law" এই উদ্দেশ্য নিয়ে। যার অর্থ ভারতবাসীকে অত্যাচার থেকে রক্ষা ও তাদের ইংল্যান্ডীয় আইনের স্বত্ব ও সুবিধা প্রদান করা। অবশ্য আজও অস্বীকার করা যাবে না—কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের একাধিক ইংরেজ বিচারপতি বিচারকের আসনে বসে ভারতবাসীকে ন্যায্য-বিচার দিয়ে গিয়েছেন। কলকাতা সুপ্রিমকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি স্যার ইলিজা ইম্পে নিজের নাম স্মরণীয় করে গিয়েছেন। মহারাজ নন্দকুমারের মামলার জন্য শিক্ষিত বাঙালির সমাজের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। মোটামুটি সকলেরই জানা তিনিই নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন।

ফাঁসি নিয়ে গবেষণা করলে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির কাহিনী উঠে আসতে বাধ্য। সিভিলিয়ান বেভারিজ ও স্যার জেমস ফিটসস্টিভেনের নন্দকুমারের নামে আনীত জাল-চক্রান্ত মামলায় কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের চিপ জাস্টিস স্যার ইলিজা ইম্পে সম্বন্ধে অনেক কাহিনী। ১৭৩২ সালে স্যার ইম্পে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। (তখন কলকাতা ছিল জঙ্গলে ভরা।) তাঁর বাবা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। পলাশি-যুদ্ধের পাঁচ বছর আগে ইম্পে বিলাতের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। ১৭৫৭ সালে তিনি বি.এ. পাশ করেন। ভারতে তখন পলাশির যুদ্ধ। তারপর তিনি আইন পড়তে শুরু করেন। ওয়েস্ট-মিনিস্টারে থাকার সময় ওয়ারেন-হেস্টিংসের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তখন অবশ্য কেউ জানতেন না যে, একজন হবেন ভারতের ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর-পরবর্তীকালে গভর্নরজেনারেল আর অপরজন অলঙ্কৃত করবেন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতির পদ। ইম্পে

যদিও হেস্টিংসের চেয়ে ছ'বছরের বড় ছিলেন, তবু তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব অটুট ছিল। ভারতে এসেও তাদের বন্ধুত্বে কোনও চিড় ধরেনি।

১৭৭৯ সালে কলকাতায় স্যার ইলিজা ইম্পে যখন খুব অসুস্থ—তখন হেস্টিংস তাঁর আলিপুরে বাগান বাড়িতে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ইম্পেও সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। ইংল্যান্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি উইলিয়াম কাউপার ইম্পের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ইম্পে ও তাঁর সহযোগী তিনজন বিচারপতি ১৭৭৪ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতার চাঁদপাল ঘাটে অবতরণ করেন।

পার্লামেন্টের যে আইন অনুসারে গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল এবং সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল, উক্ত আইনের মধ্যে অনেক গলদ দেখা দেওয়ায় প্রশাসন ও সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা দিয়েছিল। উভয়পক্ষই নিজ নিজ প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। নন্দকুমারের মামলা নিয়ে কাউন্সিল ও সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে বিরোধ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। নন্দকুমার এরকম এই বিরোধের শিকার হয়েছিলেন।

১৭৮০ সাল পর্যন্ত কাউন্সিল ও সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বিবাদ মেটেনি। ওয়াঁরেন হেস্টিংস ছিলেন বুদ্ধিমান ও ধূর্ত প্রাশাসক। অনুমান করে দু'দলের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তিনি ইলিজা ইম্পেকে সদর-দেওয়ানি-আদালতে বিচারকের পদে বসিয়েদেন। ইম্পের বেতন ছিল পাঁচহাজার টাকা। হেস্টিংসের দৌলতে ইম্পের ডবল চাকরি হল। এক দিকে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অপরদিকে সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক। কিন্তু এত পেয়েও স্যার ইম্পে খুব খুশি ছিলেন না। তাঁর প্রধান শত্রু ছিলেন কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস। তিনি স্বদেশে ফিরেও ইম্পের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ছাড়েন নি। স্যার ইম্পে ১৭৮০ সালের ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে আসীন ছিলেন। ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে তিনি স্বদেশে পৌঁছেছিলেন তাঁর শেষ জীবনটা প্রিয়বন্ধু হেস্টিংসের মতোই বিষাদময় হয়ে উঠেছিল।

ইম্পের আমলে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে জনসাধারণের জানার মধ্যে দুটি বড় মামলার শুনানি হয়েছিল। একটি 'মহারাজ নন্দকুমারের নামে জাল-মামলা' আর অন্যটি 'পাটনা কজ' নামে বিখ্যাত মামলা। বিচারক ও মানুষ হিসাবে ইম্পের দোষগুণ দুই-ই ছিল। যা থাকে প্রত্যেক মানুষের। ভারত ছেড়ে দেশে ফিরে যাওয়ার সময় সমগ্র আর্মেনিয়ান, হিন্দু-সমাজ ইংরেজ সহ প্রায় সব সম্প্রদায়ের মানুষ তাকে বিদায় জানিয়েছিলেন, তাঁকে ইংরেজ সম্প্রদায় যে অভিনন্দন স্মারকটি

দিয়েছিলেন—তাতে প্রথম সাক্ষর করেছিলেন তদানীন্তন কলকাতা জেলের বড় কর্তা মিঃ ম্যাক্রেবী। নন্দকুমার তাঁরই হেফাজতে কলকাতার কারাগারে ছিলেন। কিন্তু ম্যাক্রেবী ছিলেন হেস্টিংসের চিরশত্রু ফ্রান্সিস সাহেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এই ফ্রান্সিসের জন্য ভবিষ্যতে ইম্পেকে খুব লজ্জিত হতে হয়েছিল। ইম্পের লেখা একটি চিঠির হদিস পাওয়া যায়। চিঠিটি স্যার ইম্পে লিখেছিলেন বারওয়েল সাহেবকে— ১৭৮১ সালের ২৭শে জানুয়ারি। তাতে লেখা ছিল—**"The Sudder Dewani Adalat is placed under my management. It will be agreeable thing to me but as it was the Governor's act, Iam contended."**

তা থেকে বোঝা যাচ্ছে—সদর দেওয়ানি আদালতে তাঁকে যে হেস্টিংস বসিয়েছিলেন নিজের স্বার্থে, তাতে স্যার ইলিজা ইম্পে খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মেনে নিতে হয়েছিল বন্ধু হেস্টিংসের ইচ্ছাকে মূল্য দিতে।

কলকাতা হাইকোর্টে এখনও স্যার ইম্পের দু'টি সুবিশাল তৈলচিত্র রয়েছে, তৈলচিত্র দু'টি দেখলে বোঝা যাবে যে, তিনি পরচুলা পরে লাল-পোশাকে বিচারকের আসনে বসে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। দুটি ছবির একটির চিত্রকর ছিলেন কেটল, অন্যটির জোফানির। প্রথম ছবিটি আঁকা হয়েছিল নন্দকুমারের মামলার পর। আর জোফানির সম্ভবত এঁকেছিলেন ইম্পের ভারত ত্যাগের পর।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নন্দকুমার মামলায় স্যার ইম্পের সহযোগী ছিলেন রবার্ট চেম্বার্স। চেম্বার্স ১৭৬১ সালে এম. এ. পাশ করেন। ১৭৬৫ সালে মিডল টেম্পল থেকে তিনি বি. সি. এল উপাধি পান। রবার্ট চেম্বার্স ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ব্যক্ত ও দক্ষ বিচারক। স্যার উইলিয়াম ব্লাকস্টোন অবসর গ্রহণ করলে রবার্ট চেম্বার্সকে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটিতে আইন-অধ্যাপকের পদ দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করার জন্য জনসন সাহেব হেস্টিংসের কাছে একটি সুপারিশ পত্র পাঠিয়েছিলেন বলে ডাক্তার জনসনের জীবনী থেকে জানা যায়। ডাঃ জনসন ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ রামেলাস প্রণেতা, স্যার রবার্ট চেম্বার্সের অন্য দু'জন সহযোগী বিচারপতি ছিলেন স্যার লিমেস্টার ও স্যার হাইড। তাঁরাও স্যার রবার্ট চেম্বার্সের পাণ্ডিত্যকে সম্মান করতেন।

নানা পুঁথিপত্র থেকে জানা যায় অগাধ পাণ্ডিত্য থাকলেও স্যার রবার্ট চেম্বার্স দৃঢ়চিত্ত ছিলেন না। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সদাশয়, তিনি যদি দৃঢ়চেতা হতেন তাহলে স্যার ইলিজা ইম্পের সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহমত পোষণ করে নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ স্বাক্ষর করতেন না। স্বভাবতই নন্দকুমার ফাঁসির দণ্ড

থেকে প্রাণে বেঁচে যেতেন।

অনেকেরই মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে জালিয়াতির অভিযোগে কি প্রাণদণ্ডের আদেশ ভারতের স্বীকৃত আইন ছিল?

সম্রাট দ্বিতীয় জর্জের আইন অনুসারে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল-অপরাধের চার্জ (অভিযোগ) গঠন করা হয়। ইম্পের সহযোগী বিচারপতি চেম্বার্স আপত্তি করেছিলেন এই মর্মে যে—নন্দকুমারের বিরুদ্ধে যে জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে—তার বিচার সম্রাট দ্বিতীয় জর্জের আইন অনুসারে হতে পারে না। দ্বিতীয় জর্জের আইন অনুসারে জালিয়াতির দণ্ড ছিল ফাঁসি। সুতরাং নন্দকুমারের বিচার হোক সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের আইন অনুসরণ করা হলে মহারাজ নন্দকুমারের অন্তত ফাঁসি হত না। এলিজাবেথের আইনে জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণ হলেও ফাঁসির বিধান ছিল না। স্বভাবতই নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ দেওয়া যেত না। ইম্পে বিচারপতি হিসাবে ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, স্যার চেম্বার্স তাঁর হৃদয়ের দুর্বলতার জন্য আইনের কূটকচালি না করে স্যার ইম্পের মত অনুসরণ করে সম্রাট দ্বিতীয় জর্জের আইন অনুসরণ করে মহারাজ নন্দকুমারের বিচারকার্য শুরু করেন সহযোগী বিচারপতিদের সঙ্গে। এরপর পুরো মামলাটি প্রতিদিন বিচারকের বেঞ্চে বসে অন্যান্যদের সঙ্গে শুনেছিলেন। শেষপর্যন্ত মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশেও স্বাক্ষর করেছিলেন।

ইম্পে ভারতবর্ষ থেকে চলে যাওয়ার পর ১৭৭১ সালে স্যার চেম্বার্স কলকাতা সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনে বসেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ ছেড়েছিলেন ১৭৯৯ সালে, স্যার চেম্বার্স কলকাতায় থাকার সময় এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতিত্ব করেছিলেন। স্যার চেম্বার্সের কলকাতার বাড়িতে একটি সুবৃহৎ লাইব্রেরি ছিল। এই লাইব্রেরিতে সংস্কৃত, উর্দু, ফারসি প্রভৃতি বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান একাধিক বই ছিল। একাধিক সংস্কৃত বইয়ের পাণ্ডুলিপি ছিল এই নিজস্ব লাইব্রেরিতে। এই গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলি বার্লিনের রয়াল লাইব্রেরি উচ্চমূল্যে কিনে নিয়েছিল।

স্যার উইলিয়াম জোন্সও কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তাঁকে 'কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের রত্ন' বলা হত। তিনি ভারত-হিতৈষী ছিলেন। স্যার জোন্স অবশ্য মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির ৫-৬ বছর পর কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি 'মনুসংহিতা'র ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৭৯৪ সালে অনুবাদ করা বই ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়েছিল। জোন্স 'Digest of Hindu and Mohamedan Law' নামে একটি

মূল্যবান বই লিখেছিলেন।

কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে ১৭৭৪ সাল থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত যেসব চিফ্ জাস্টিস ও পিউনি জর্জ বসে ছিলেন যথাক্রমে—

		(চিফ জাস্টিস)	সাল
(১)	স্যার	ইলিজা ইম্পে	—১৭৭৪
(২)	,,	রবার্ট চেম্বার্স	—১৭৭১
(৩)	,,	জন এন্সট্রথার	—১৭৯৮
(৪)	,,	হেনরি রসেল	—১৮০৬
(৫)	,,	এডওয়ার্ড হাইড্	—১৮১৩
(৬)	,,	রবার্ট ব্লাসেট	—১৮২৩
(৭)	,,	ক্রিস্টোফার বুলার	—১৮২৪
(৮)	,,	চার্লস গ্রে.	—১৮২৫
(৯)	,,	উইলিয়াম রসেল	—১৮৩২
(১০)	,,	এডওয়ার্ড রায়ান	—১৮৩৩
(১১)	,,	লকেন্স পিল	—১৮৪২
(১২)	,,	জেমস কলভিলি	—১৮৫৬
(১৩)	,,	বার্নিস পীকক	—১৮৫৯

		পিউনি জজ	সাল
(১)	স্যার	রবার্ট চেম্বার্স	—১৭৭৪
(২)	,,	স্টিপেন সিজার সিমেস্টার	--১৭৭৪
(৩)	,,	জন হাইড	—১৭৭৪
(৪)	স্যার	উইলিয়াম জোন্স	—১৭৮৩
(৫)	,,	উইলিয়াম ডনকিন	—১৭৯১
(৬)	,,	জেমস ওয়াটসন	—১৭৯৬
(৭)	,,	হেনরি রসেল	—১৭৯৮
(৮)	,,	উইলিয়াম বারোজ	—১৮০৬
(৯)	,,	ফ্রান্সিস ম্যাকনাটন	—১৮১৫
(১০)	,,	এন্থনি বুলার	—১৮১৬
(১১)	,,	জন ফ্রাঙ্কস	—১৮২৫

	পিউনি জজ	সাল
(১২) „	এডওয়ার্ড বায়ন	—১৮২৭
(১৩) „	পিটার গ্রান্ট	—১৮৩৩
(১৪) „	বি. কে. ম্যালকিন	—১৮৩৫
(১৫) „	এইচ. ডব্লু. সিটন	—১৮৩৮
(১৬) „	আর্থার বাটলার	—১৮৪৮
(১৭) „	উইলিয়াম কলভিলি	—১৮৫৫
(১৮) „	চার্লস জ্যাকসন	—১৮৫৫
(১৯) „	মর্ডান্ট ওয়েলস	—১৮৫৯

নন্দকুমারের ফাঁসির আগে কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট বহু বিচিত্র মামলায় ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল। কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটর্নি ছাড়াও বহু ব্যারিস্টার আইন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের ফি অত্যধিক ছিল, ফলে তাঁদের কবলে পড়ে বহু ধনী ব্যক্তিও বাড়ি-ঘর বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ব্যারিস্টাররা সবাই প্রায় ইংরেজ ছিলেন। বছর কয়েক ব্যারিস্টারি করে তাঁরা বহু টাকা-পয়সা আয় করে দেশে ফিরে যেতেন।

তখনকার দিনে ফাঁসি-দেওয়া ব্যাপারটা চুপিসারে হত না। প্রকাশ্যস্থানে অসংখ্য-জনতার মধ্যে ভীতি-সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই ফাঁসি লটকানো হত। বেত্রাঘাত, তুড়ুমের ব্যবস্থা সবই প্রকাশ্য স্থানে হত। লালবাজার থেকে বড় বাজারের মধ্যে জনাকীর্ণ স্থানে বাজারের মধ্যে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ঘুরিয়ে চাবুকের আঘাত করা হত।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি কুলিবাজারের মাঠে হয়েছিল বলে শোনা যায়। আবার অনেকে বলেন বর্তমান আউটরাম ঘাট ছাড়িয়ে আরও কিছুটা দক্ষিণে ফাঁসির মঞ্চ-বানিয়ে মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

১৭৯১ সালের ১৮ আগস্টের গেজেট থেকে জানা যায়—অনেক অভিযুক্ত অপরাধীকে বিচারার্থে সুপ্রিম কোর্টে আনা হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকের দোষ প্রমাণ হওয়ায় তাদের হাত পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেককে গরম লোহা দিয়ে ছ্যাকা দেওয়াও হয়েছিল। এছাড়াও দণ্ড-কাষ্ঠে হাত দুটি বেঁধে অপরাধীদের মাথা-গলিয়ে দেওয়া হত। সাধারণের কাছে তাদের অপমানিত করার অভিপ্রায়ে। অনেকসময় দেখা গিয়েছে সেকালের আইনের চোখে চুরি, ছিনতাই, জাল প্রভৃতি অপরাধ খুনের থেকেও গুরুতর বলে বিবেচিত হত।

বিচিত্র ফাঁসির দু'একটি নমুনা দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৮০৭ সালের জুনমাসে একজন ম্যানিলাবাসী এক বাঙালি স্ত্রীলোককে ছুরি মেরে হত্যা করে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারে তার ফাঁসির আদেশ হয়। আদেশের শেষ অংশটুকু—"To be executed on saturday the 13th, at the four roads, which meet at the head of lalbazar." অর্থাৎ লালবাজারের চৌমাথায় লোকটিকে ফাঁসি দিতে হবে। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ছিলেন 'এশিয়া' নামক এক জাহাজের কর্তা। সালটাছিল ১৮১৩। তাঁর অধীনস্থ জনা-পাঁচেক নাবিক কোনও কারণে উত্তেজিত হয়ে ক্যাপ্টনকে হত্যা করে। বিচারে নাবিকদের ফাঁসির আদেশ হয়। অন্যান্য নাবিকদের মনে ভীতিসঞ্চার করতে ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার জন্য এক বিচিত্র উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল। গঙ্গা বক্ষে দুটি গাধাবোট পাশাপাশি লাগিয়ে তার উপর তৈরি করা হয় ফাঁসির মঞ্চ। ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল আশপাশের জাহাজে যেসব নাবিকরা রয়েছে তাদের বোটে করে আসতে হবে উক্ত ফাঁসির আসামিদের ফাঁসি দেখতে। ফাঁসির দিন খুব ভোরে ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গ থেকে কামান ধ্বনি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাহাজের নাবিকরা আদেশ মোতাবেক জড়ো হল ফাঁসির মঞ্চের কাছে। কাছাকাছি জাহাজগুলির ডেকেও দেখা গেল লোকের ভিড়। বেলা ন'টার সময় নিয়ে আসা হল দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামিদের ফাঁসির মঞ্চে। ওল্ডফোর্ট ঘাটের কাছাকাছি মঞ্চটি তৈরি করা হয়েছিল। বেলা ন'টা কুড়ি মিনিটে পুনরায় তোপধ্বনি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামি পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হল।

১৮২৮ সালের জানুয়ারি মাসে একটি বিচিত্র মানসিকতার ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ফাঁসির আসামি ছিল এক ফকির। যে ইউলিয়াম বোচাম্প নামে এক সাহেব-শিশুকে হত্যা করেছিল। তখন হাওড়ার যে জায়গাটা স্কুলগ্রাউন্ড বলে পরিচিত ছিল, সেখানে ফাঁসির মঞ্চটি তৈরি হয়েছিল। আশপাশের বাসিন্দারা অধিকাংশই ছিল মুসলমান। অনেকেই ফকিরের ফাঁসি দেখতে ভিড় জমিয়েছিল। যথাসময়ে ফকিরের ফাঁসি হয়ে গেল।

এবার এক পেটুকের ফাঁসির কথায় আসা যাক। কলকাতা জেলের কাছাকাছি একটি মাঠে ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা হল পেটুকটির। আসামির শেষ ইচ্ছায় তাকে ভাত খেতে দেওয়া হল। সিপাইরা তলোয়ার খুলে তাকে পাহারা দিচ্ছিল। জেলার জিজ্ঞাসা করলেন, সব ঠিক আছে তো?

তিনিও ছিলেন মুসলমান। তিনি ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন—'স্যার, দণ্ডপ্রাপ্ত লোকটির এখনও খাওয়া শেষ হয়নি। আসামি জেলারের কথা শুনতে

পেয়ে বলল—'স্যার, আর এক মিনিট অপেক্ষা করুন, এই ক'টা ভাত আমাকে খেয়ে শেষ করতে দিন।'—এই বলে সে ভাতকটা খেয়ে নিল। একটি পাত্রে খানিকটা দুধ ছিল, সেটুকুও চুমুক দিয়ে খেল। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার আর কিছু বলার আছে?' লোকটি বক্‌বক্ করে নানা কথা বলে যাচ্ছিল ভাবলেশহীন ভাবে। এবার লোকটির ফাঁসি হয়ে গেল।

ফাঁসি নিয়ে পুরানো কলকাতার ইতিহাসে অনেক বিচিত্র কাহিনী পাওয়া যায়। ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসির আগে এত দামামা বাজেনি। অবশ্য সময়ের সঙ্গে সবই বদলায়। পরাধীন ভারতে ফাঁসির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বাধীনভারতে মানবিকতাবোধ নিশ্চয়ই বেড়েছে। স্বাধীনতার পরেও একাধিক ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে—কিন্তু ফাঁসুড়েকে প্রকাশ্যে আনা হয়নি, সেইদিক থেকে নাটা মল্লিক এখন 'নাটাবাবু' নিশ্চয়ই ভাগ্যবান।

কলকাতা সুপ্রিমকোর্টের শেষ প্রধান ছিলেন স্যার বার্নেস পীকক। সম্ভবত ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত। ১৮৬২ সালে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের পরিবর্তে কলকাতা হাইকোর্ট স্থাপিত হলে—তার প্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন স্যার পীকক। ১৭৭০ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ন্যায়-বিচারক হিসাবে সুনাম ছিল।

ইংরেজ আমলে কোনও অপরাধীর প্রাণদণ্ড হলেও প্রেসিডেন্টের মতামত নিতে হত। তবে বেত্রাঘাত, চাবুক মারা, কয়েদ করা প্রভৃতি দণ্ডগুলির ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের মতামতের প্রয়োজন হত না।

মেয়রের আদালতের তলায় ছিল জমিদারি আদালত। জমিদার মশাই কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটের দুটো পদের কাজই করতেন। ইংল্যান্ডীয় আইন অনুসারে যে সব মামলা-মোকদ্দমার বিচার হত—সেগুলি করতেন মেয়র।

স্যার ইম্পেকে ওয়ারেন হেস্টিংস সব সময়ই বিশেষ কদর করতেন। স্যার ইম্পে প্রথমে বসবাস করতেন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বাড়ির একাংশে। পরে বসবাসের জন্য চলে এসেছিলেন পার্কস্ট্রিটের এক সুবৃহৎ উদ্যানসমৃদ্ধ বাড়িতে। বাড়িটির ব্যবস্থার পিছনেও হেস্টিংসের হাত ছিল। চতুর্দিকে পার্ক ছিল। বর্তমানে 'লরেটো কনভেন্ট' স্কুল বাড়িটিই স্যার ইলিজা ইম্পের আবাসভবন। সেসময় পার্ক স্ট্রিট ও তার দক্ষিণাঞ্চল ছিল জঙ্গলপূর্ণ। তখনকার অস্ত্রধারী বহু সিপাই চিফ জাস্টিস, ইম্পের বাড়ি পাহারা দিত। ১৭৬০-১৭৬৪ সাল অর্থাৎ ইম্পের আমলে এই পার্ক পূর্ব-পশ্চিমে বর্তমান রাসেল স্ট্রিট থেকে ক্যামাক স্ট্রিটের সব থেকে বিশাল বাড়িটি ছিল সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ ডব্লু সি. ব্যানার্জির বাসভবন।

পূর্বেই বলা হয়েছে হাইড সাহেবও ছিলেন মহারাজা নন্দকুমারের মামলার একজন বিচারক। তিনি যেখানে থাকতেন, বর্তমানে সেখানে টাউনহল। তাঁকে মাসে ১২০০ টাকা ভাড়া দিতে হত। তাঁর স্ত্রী সেকালে বড় বড় ইংরেজ ও ব্যারিস্টারদের প্রতিটি টার্মের আগে একটি করে ভোজসভার আয়োজন করতেন। বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের অধিকৃত স্থানে ১৭৮৪ সালে নতুন কোর্ট-হাউস স্থাপিত হয়েছিল। তখন মিসেস হাইডের দেওয়া ভোজসভায় ইংরেজ ব্যারিস্টার ও অ্যাটর্নিরা যোগ দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতেন। এছাড়াও 'টার্ম' আরম্ভ হওয়ার দিনে প্রাতঃরাশ করে ব্যারিস্টাররা একযোগে আদালতে যেতেন। এখনকার দিনে এসব ভাবাও যায় না।

স্যার ফ্রান্সিস যতদিন এদেশে ছিলেন ততদিন তিনি সব কাজেই হেস্টিংসের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেভারিজের মতে—যদি ফ্রান্সিস ও হেস্টিংসের মধ্যে ভীষণ মতান্তর না ঘটত, তাহলে, হয়তো মহারাজ নন্দকুমারের নামে জাল-মোকদ্দমা আদৌ আনা হত না। ফ্রান্সিসকে পেয়ে ও তার সঙ্গে সখ্যতা জমানোয় নন্দকুমার কাউন্সিলের নিকট হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ-গ্রহণের অভিযোগ আনতে সাহসী হয়েছিলেন। এরফলেই নন্দকুমারের নামে চক্রান্ত ও জালমোকদ্দমার অভিযোগ আনা হয়েছিল হেস্টিংসের কারসাজিতে।

স্যার ইম্পে ও তাঁর কয়েকজন সহযোগী যখন প্রথম এসে চাঁদপাল ঘাটে নেমেছিলেন—তখন আশপাশের সাধারণ মানুষ তাঁদের দেখার জন্য চাঁদপাল ঘাটে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল নগ্নগাত্র। তাদের দুরবস্থা দেখে স্যার ইম্পে বিস্ময় প্রকাশ করে সহযোগীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—

"See brother!" the wretched victims of tyrrany! The crown court was not surely established before it was needed. I trust it will not have been in operation six months before we shall see all these poor creatures comfortably clothed in shoes and stockings—(HEA Cotton's Calcutta Old and New, 1st ed Page-324.

১৭৭৩ সালের চার্টারে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রাণপ্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচার শুরু হয়েছিল ১৭৭৪ সাল থেকে স্যার ইলিজা ইম্পে চিফ জাস্টিস হয়ে আসার পর থেকে। অথচ ইংরেজ কোম্পানি ১৬১৮ সালে কলকাতা, সুতানুটি, ও গোবিন্দপুরের জমিদারি স্বত্ব কিনেছিল। ১৬১৮ থেকে মেয়র কোর্ট না হওয়া পর্যন্ত কলকাতায় সুষ্ঠু বিচারের জন্য কোনও বিধিবদ্ধ আদালত ছিল না। সুপ্রিমকোর্ট-বাড়িটি ছিল দ্বিতল।

ওপরতলায় ছিল 'গ্রান্ড জুরি রুম' আর নিচের তলায় ছিল আদালত। এই আদালত বাড়িটির একটি কক্ষে সুপণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্সের বিশ্রামস্থল। তিনি ১৭৮০ সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সমগ্র বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জন্য কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট হওয়া সত্ত্বেও আরও দুটি আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি 'সদর নিজামত আদালত' ও অন্যটি 'সদর দেওয়ানি আদালত।' ১৮৬২ সালের ১৪ মে হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সদর দেওয়ানি আদালত সদর নিজামত আদালত সহ সুপ্রিম কোর্টের লোপসাধন হয়।

আবারও ফেরা যাক নন্দকুমারের আলোচনায়। 'ওয়ারেন হেস্টিংসের সম্বন্ধে সেকালে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল—'।

"হাতি পর হাওদা, ঘোড়ে পর জীন।
জলদি যাও, জলদি যাও, ওয়ারেন হস্টিন।"

এগারো বছর ওয়ারেন হেস্টিংস এই দেশে শাসনকার্য চালিয়েছিলেন ও ভারতের শাসনশক্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮১৮ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের মৃত্যু হয় স্বদেশে।

১৭৬২ সালে 'বেলভেডিয়ার' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইসময় গভর্নরের একটি বাগানবাড়ি নির্মাণের প্রস্তাব বিলাতে 'কোর্ট অব ডাইরেক্টর'-এর কাছে পাঠানো হয়।

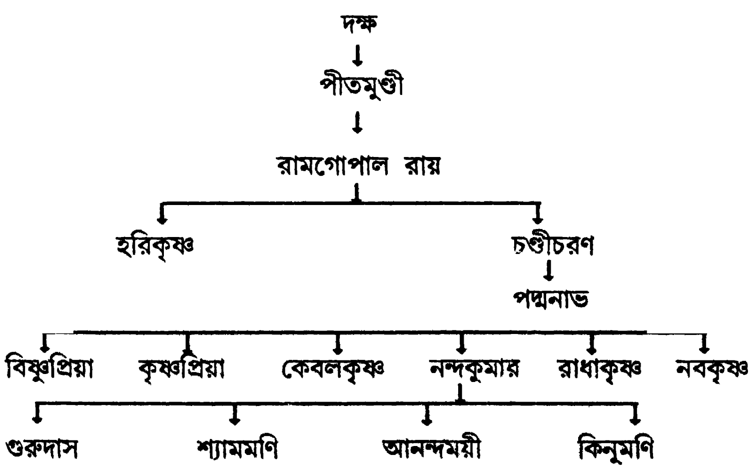
বেলভেডিয়ারে মিঃ ফ্রাঙ্কল্যান্ডের বাড়িটি কিনে নিয়ে সেটি গভর্নরের বাগানবাড়িতে পরিণত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু তা বিলেতের কর্তারা নাকচ করে দিয়েছিলেন। সে সময় প্রস্তাব নাকচ হলেও ১৭৭০ সালে বেলভেডিয়ারে গভর্নরের বাগানবাড়ি শেষপর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছিল। এর পাঁচ বছর বাদে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হয়ে আলিপুরে মনের মতো করে একটি বাগানবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। নানাসূত্র থেকে জানা যায়, বেলভেডিয়ারে কোনও একটি বাড়িতে কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। তাছাড়াও তাঁর একাধিক বাড়ি ছিল কলকাতায়। এই আলিপুরের বাড়িতেই তিনি নন্দকুমার চক্রান্ত মামলায় প্রধান নায়ক কামালউদ্দিন শেখের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন।

মহারাজ নন্দকুমার ১৭০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাংলার মুসলমান রাজত্বের প্রায় অবসানকালে এবং ইংরেজ-শক্তির অভ্যুদয়। নিজ বুদ্ধিতে ও প্রতিভায় নন্দকুমার অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাংলার মানুষ খুব শ্রদ্ধা করতেন নন্দকুমারকে তিনি কশ্যপ গোত্রীয় পীতমুণ্ডি

গ্রাম্য রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কুলীন ছিলেন না। তাঁরা দুটি শাখায় বিভক্ত ছিলেন—যথাক্রমে 'ধবল' ও 'মলিন'। নন্দকুমার ছিলেন 'ধবল' শাখার অন্তর্ভুক্ত পীতমুণ্ডি উপাধি ত্যাগ করে তাঁর পূর্ব পুরুষরা 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাদের নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর উপবিভাগের অন্তর্গত জরুল গ্রাম। পরবর্তীকালে নন্দকুমারের পূর্বপুরুষ রামগোপাল রায় মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত অধুনা বীরভূমের ভদ্রপুর (ভাদুর) গ্রামের আচারভ্রষ্ট মথুরানাথ মজুমদারের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। এ কারণে জাতিবর্গের উৎপীড়নে ভদ্রপুর গ্রামেই তিনি বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রামগোপালের ছোটছেলে, চণ্ডীচরণ। এই চণ্ডীচরণের প্রথম স্ত্রীর গর্ভে জন্মেছিলেন নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভ রায়। তাঁর তৃতীয় সন্তান ছিলেন নন্দকুমার। তার উপর দু'দিদি ছিলেন যথাক্রমে—বিষ্ণুপ্রিয়া ও কৃষ্ণপ্রিয়াদেবী আর তাঁর ছোট তিনভাই ছিলেন কেবলকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ ও নবকৃষ্ণ।

নন্দকুমারের স্ত্রীর নাম ছিল ক্ষেমঙ্করী দেবী, তাঁদের চার সন্তান ছিল। তাদের একমাত্র পুত্র গুণধরকে বলা হত রোজা গুরুদাস গৌড়পতি। মহারানি জগদম্বা ছিলেন গুরুদাসের পত্নী। নন্দকুমারের তিন মেয়েরা ছিলেন—শ্যামমণি, আনন্দময়ী ও কিনুমণি। তাঁর বংশের একটি তালিকা দিলে পাঠক-পাঠিকার বুঝতে সুবিধা হবে।

কশ্যপ-গোত্রীয়



নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে ফতে সিংহ, ঘোড়ানাটাও সাতসইকা এই তিন খাস-পরগণার কর সংগ্রহকের পদে নিযুক্ত

হয়েছিলেন। নন্দকুমার তাঁর পিতার সঙ্গে কাজ করায় রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তাঁর পারদর্শিতার জন্য তাঁকে সহকারী আমিন হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

১৭৪০ সালে নবাব সরফরাজ খাঁর পতনের পরে আলিবর্দী খাঁ বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব হন। এসময় নন্দকুমারের বয়স ছিল ৩৫ বছর। আলিবর্দীর আমলে নন্দকুমারকে বসানো হয়েছিল হিজলি ও মহিষাদল পরগনার আমিন পদে। আমিনের পদ পেলেও নন্দকুমারের জীবনে বিপত্তি দেখা দিয়েছিল। আদায়ের টাকা একবারে নবাবের কোষাগারে জমা দিতে না পারায় নবাব তার উপর রুষ্ট হলেন। ৮০০০০ টাকা ঠিক সময় জমা না দিতে পারায় নবাবের খালসা দেওয়ান রায়রায়ান চয়েন রায়ের কাছে নন্দকুমারের নামে অভিযোগ উঠেছিলেন। রায়রায়ান ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে আমিনের পদ থেকে সরিয়ে দেন। এবং বাকি টাকা জমা দেওয়ার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় ও মুর্শিদাবাদে ডেকে পাঠানো হয়। অবশেষে তাঁর পিতা পদ্মনাভ রায় নন্দকুমারের অসহায়তার কথা বুঝতে পেরে বাকি টাকা জমা দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর নন্দকুমার নবাব ঔরঙ্গ জেবের নায়েব হোসেন কুলি খাঁর কাছে একটি কাজের প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু খালসা দেওয়ানের বিরুদ্ধাচরণের জন্য তাকে কোনও কাজ দেওয়া হয়নি। উপায়ান্তর না দেখে এসময় নন্দকুমার নানা কৌশলে প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় নন্দকুমার আবার একটি ভুল পথে পা বাড়িয়ে মুস্তাফা খাঁর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। সৈন্যদের বেতন বাকি পড়ায় মুস্তাফা খাঁ কয়েকটি জমিদারির থেকে টাকা আদায় করার প্রচেষ্টায় বেশ ক'জন জমিদার নন্দকুমারের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে মুস্তাফা খাঁর এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে অনুরোধ জানান। নন্দকুমার সেইসব জমিদারদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসায় মুস্তাফা খাঁ জমিদারদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারছিলেন না। স্বভাবতই মুস্তাফা খাঁ বেজায় ক্রুদ্ধ হয়ে নন্দকুমারকে বন্দি করার সংকল্প নিয়েছিলেন। মুস্তাফার ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে নন্দকুমার কলকাতায় পালিয়ে গেলেন।

ভাগ্য ভালো হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই মুস্তাফা খাঁ ও তার দেওয়ানের মৃত্যু হওয়ায় নন্দকুমার আবার মুর্শিদাবাদে ফিরে এলেন। বহু চেষ্টায় সাতসইবন পরগনার আমিনের পদলাভ করেন। কিন্তু এই পদে প্রয়োজনীয় আয় না হওয়ায় আমিনের পদ ছেড়ে দিয়ে নন্দকুমার চলে এসেছিলেন হুগলিতে। হুগলিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে না পারায় তিনি পুনরায় মুর্শিদাবাদে চলে এসেছিলেন। হুগলি থেকে

মুর্শিদাবাদ আসার পয়সা জোগাড় করতে না পারায় তাঁকে নিজের ব্যবহার্য মূল্য একটি শাল বিক্রি করতে হয়। নানা বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে হুগলির দেওয়ান মহম্মদ ইমারবেগ খাঁর অনুকম্পা আদায় করায় নন্দকুমারকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করা হয়। দেওয়ানের পদ পেয়ে দূর হল নন্দকুমারের আর্থিক কষ্ট। এসময় থেকে তিনি দেওয়ান নন্দকুমার নামে অভিহিত হতে লাগলেন। নবাব আলিবর্দীর মৃত্যু হওয়ায় যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ বেঁধে গেল। এসময় সিরাজউদ্দৌলা রাজা মানিকচাঁদকে ফৌজদার নিযুক্ত করলেন। মহম্মদ আলিকে দিয়ে হুগলির ফৌজদারি চালানো সম্ভব না হওয়ায় নন্দকুমারকে নিযুক্ত করা হয়েছিল হুগলির ফৌজদার হিসেবে।

লর্ড ক্লাইভ এসময় চন্দননগর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে নন্দকুমারের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন—ফরাসিদের সাহায্যের জন্য যেন তিনি সবরকম প্রস্তুতি নেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রাজা দুর্লভরামকে সৈন্য-সামন্ত দিয়ে নন্দকুমারকে সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল হুগলিতে কিন্তু নন্দকুমার এই অবস্থায় নবাবের সঙ্গে বেইমানি করেছিলেন। ইংরেজের চর উমিচাঁদ হুগলিতে এসে নানা কায়দায় নন্দকুমারকে হাত করে ইংরেজদের পক্ষ নিতে সম্মত করলেন। তাই দুর্লভরামকে সৈন্যসামন্ত সহ মুর্শিদাবাদে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইংরেজ সৈন্য চন্দননগর আক্রমণ করে তা জয় করে নিল। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে এইসময় নানান রকম ষড়যন্ত্র চলছিল—তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য। চন্দননগর জয় করায় ইংরেজদের শক্তিবৃদ্ধি হল। সব ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নবাব নন্দকুমারকে পদচ্যুত করে, হুগলিতে একজন নতুন ফৌজদারি নিয়োগ করলেন। পরে নন্দকুমার তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি বসে থাকার লোক ছিলেন না। ক্লাইভকে চন্দননগর জয় করতে সাহায্য করায় ক্লাইভ নবাবকে অনুরোধ করে পুনরায় তার দেওয়ানি ফিরিয়ে দেন। এছাড়াও ইংরেজ কোম্পানির অধীনে একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হল নন্দকুমারকে।

নবাব মীরজাফর চুক্তির টাকা শোধ করতে না পারায় নদীয়া ও বর্ধমানের রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা ইংরেজদের ছেড়ে দেন। ১৭৫৮ সালের ১৯ আগস্ট ইংরেজ কোম্পানি এই দুই স্থানের তহশীলদারী প্রদান করে নন্দকুমারকে। তিনি ইংরেজের কথামতো চলছিলেন ও যথাযথ খাজনা আদায় করে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন ইংরেজ সেরেস্তায়। মুর্শিদাবাদের নবাব নন্দকুমারের মনোভাব বুঝতে পেরেও

ইংরেজদের জন্য নন্দকুমারকে পদচ্যুত করতে পারছিলেন না। নবাব প্রতিটি কাজে দোষ ধরায় নন্দকুমার বাধ্য হয়েছিলেন পদত্যাগ করতে। নানা ব্যাপারে ওয়ারেন হেস্টিংসও কিন্তু নন্দকুমারের উপর বিরক্ত ছিলেন। ক্লাইভ সব বিষয়ে নন্দকুমারকে সহায়তা করায় হেস্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারছিলেন না। নন্দকুমারের জন্য অনেক ক্ষেত্রে হেস্টিংস নিজস্ব তহবিল বাড়াতে পারছিলেন না। স্বভাবতঃই তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

পুরোনো ইতিহাসে 'চাঁদপাল' ঘাটের নাম পাওয়া যায়। এর সামনেই একটিমাত্র মুদিদোকান ছিল। তার মালিক ছিলেন চন্দ্রনাথ পাল নামে জনৈক ব্যক্তি। কাছাকাছি এলাকা জঙ্গলময় ছিল। ঘাটের যাত্রীরা এই মুদিদোকান থেকেই মালপত্র কিনতেন। আশ্চর্যের বিষয় নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন—সে সময়কার ইতিহাসে কিন্তু 'চাঁদপাল' ঘাটের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তদানীন্তনকালে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা কলকাতায় এসে অবতরণ করতেন এই চাঁদপাল ঘাটে।

হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় এসে নেমেছিলেন এখানেই। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে তোপধ্বনি হয়েছিল। প্রথা অনুযায়ী ১৯বার তোপধ্বনি হওয়ার কথা থাকলেও, যে কোনও কারণে হোক ১৭টি তোপধ্বনি হয়েছিল। এতে স্যার ফিলিপ বেজায় চটে গিয়েছিলেন। তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়েছিল হেস্টিংসের উপর। তিনি যতদিন এদেশে ছিলেন ততদিন সব কাজে হেস্টিংসের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।

ডেভিড হেয়ারের নামানুসারে হেয়ার স্ট্রিটের নাম হয়েছিল। এই স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ছোট আদালত।

হেস্টিংস ছিলেন ক্ষমতালোভী ও স্বার্থপর। তাঁর বিরুদ্ধে গেলে তিনি কাউকেই সহ্য করতে পারতেন না। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন গভর্নর ছিলেন সে সময় তাঁর কাউন্সিলের সভ্যদের সঙ্গে প্রায়ই তাঁর মতভেদ হত। তিনি বিলেতের গুপ্তসভার অভিমতানুসারে কলকাতা-কাউন্সিলের সভাপতির পদ পেয়েই ১৭৭২ সালের ২৮ এপ্রিল মহম্মদ রেজা খাঁ, দেওয়ান রাজা অমৃত সিংহ ও সিতাব রায়কে বন্দি করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ প্রদান করেছিলেন। এ ব্যাপারে কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্যরা তাঁদের মতামত প্রকাশ করে বলেছিলেন, মহম্মদ রেজা খাঁকে বন্দি করে কলকাতায় নিয়ে এলে সভ্যদের কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করে জেনে নেবেন, তাঁকে বন্দি করার কারণ। হেস্টিংস সভ্যদের অভিমতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন কোনও বন্দি ব্যক্তির প্রতি কোনওরকম সম্মান

দেখানো নীতিবিরুদ্ধ।

রেজা খাঁর পদচ্যুতির পর মণিবেগমকে মুর্শিদাবাদে নাবালক নবাবের তত্ত্বাবধায়ক ও রাজা গুরুদাসকে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হলে কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্য আপত্তি করেছিলেন। হেস্টিংসকে কটাক্ষ করে তাঁরা বলেছিলেন—গুরুদাসকে দেওয়ানি কাজে নিযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ—তাঁর পিতৃদেব নন্দকুমার কোম্পানির বিরুদ্ধে কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন। হেস্টিংস বুঝতে পেরেছিলেন কাউন্সিলের কটাক্ষপাত। নন্দকুমারের স্বার্থে তাঁর শত্রুতার কথা হেস্টিংস তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। তাতে লেখা হয়েছিল—নন্দকুমার তাঁকে সাতবছর ধরে নানাভাবে উৎপীড়ন করেছে কোম্পানির বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছে। সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল বন্ধুকে লেখা চিঠিটিতে। চিঠিতে আরও লেখা ছিল—নন্দকুমার তার প্রভু মীরজাফর ও তাঁর বংশধরদের পক্ষ সমর্থন করে নাকি কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণ করলেও আদালতে তাঁর দোষ প্রমাণ কারা সম্ভব নয়। সুতরাং নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তাঁকে মিথ্যার আশ্রয় ও কৌশল নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। নাহলে নন্দকুমার নাকি কোম্পানির অনেক ক্ষতি করে দিতেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস 'কোর্ট অব ডিরেক্টর'কে ১৭৭৩ সালের ১১ নভেম্বর একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ছিল। এই মনোভাব থেকে বোঝা যায়—হেস্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা মামলা রুজু করিয়েছিলেন। নন্দকুমার কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে সুবিচার পাননি।

মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে—হেস্টিংস বহু প্রচেষ্টায় কলকাতার গভর্নর হয়েছিলেন ; পরে প্রাপ্ত হন গভর্নর জেনারেলের পদটি। এত উচ্চপদ পেয়েও তিনি হীনম্মন্যতায় ভুগতেন। এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসার প্রসার ঘটিয়েছিলেন ক্লাইভ ও হেস্টিংস। কিন্তু ক্লাইভের ভাগ্যে যেসব সম্মান জুটেছিল—ওয়ারেন হেস্টিংস কিন্তু সে সব সম্মান পাননি। ক্লাইভ পেয়েছিলেন K. C. B. উপাধি। তিনি ব্যারণ হয়েছিলেন। হেস্টিংস সেসব উপাধি তো পাননি, এমনকি আর উপাধিও পাননি। স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় বিচার শুরু হয়েছিল। চলেছিল সাত বছর। অবশ্য এই বিচারের পরও তিনি অনেকদিন বেঁচেছিলেন।

১৭৭৪ সালের ১৮ মার্চের 'কলকাতা কমিটি অব রেভিনিউ' কাগজ থেকে প্রাণদণ্ড বা অন্যরকম শাস্তির কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ব্ল্যাক-জমিদারের হাতে অপরাধীদের প্রাণদণ্ডের ক্ষমতা থাকলেও মুসলমান প্রজাদের সম্বন্ধে অন্যরকম

ব্যবস্থা ছিল। চরম অপরাধ করলেও মুসলমান প্রজাদের ফাঁসি দেওয়া যেত না, কারণ নবাবি আমলের বিধান অনুসারে অপরাধী মুসলমানকে ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত করা মুসলীমরা অপমান কর বলে মনে করতেন এজন্য ইংরেজ আইনের পরিবর্তে মুসলমানদের পরিচিত বিধি অনুসারে গুরুতর অপরাধীদের প্রাণদণ্ডের আসামিদের চাবুক মেরে হত্যা করা হত। এজন্য সেসময় আদালতে 'চাবুক সওয়ার' নামে এক দল ঘাতক নিযুক্ত ছিল। এরা দু'তিন চাবুকেই অপরাধীর দফারফা করে দিত। অবশ্য এভাবে হত্যা করার আগে জমিদারকে কাউন্সিলের অভিমত নিতে হত। **Calcuta Comunittee of Revenue dated 18th March 1774- P.M. Dacres**-এর একাংশে ইংরেজিতে লেখা আছে—

"According to Alderman Bolts the 'Lamender enquires into complaints of a criminal nature among the black inhabitants in cases where the natives do not apply to the English established court of Justice. He proceeds also in the above summary way to sentence and punishment by fine, imprisonment, condemnation to work in chains up on the roads for any space of time, even for life and by Hagel lation that in capital cases even to death."

পুরোনো কলকাতায় লালদিঘির উত্তর-পূর্বে কোর্ট-হাউস অবস্থিত ছিল। এটাই ছিল প্রাচীন কলকাতার পুরোনো আদালত। লালবাজারের মোড়ে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের সংযোগস্থলে ছিল কলকাতার প্রথম জেলখানা। এরপর হরিণবাড়ি জেল তৈরি হয়।

লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে হেস্টিংসের সম্পর্ক কিছুদিন ভালো ছিল। তিনি কিছুদিন দমদমায় বসবাস করেছিলেন। তিনি ১৭৬৭ সালে স্বদেশে ফিরে যান।

কলকাতায় পুরোনো ফোর্ট ছিল কয়লাঘাটা ও স্ট্র্যান্ড রোডের সংযোগস্থলে। পুরোনো ফোর্ট দিয়ে কাজ চলছিল না। সবদিক বিচার বিবেচনা করে ১৭৫৮ সালে লর্ড ক্লাইভের প্রস্তাবে কলকাতায় নতুন কেল্লা নির্মাণের সূচনা হয়। নতুন কেল্লাটির নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিল ১৭৭৩ সালে। এটি বর্তমান গড়ের মাঠের কেল্লা। এই কেল্লাটি গোবিন্দপুর গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। ফলে এখানকার অধিবাসীদের অনেককেই গোবিন্দপুর ছেড়ে যেতে হয়েছিল।

নবাব মীরজাফরের থেকে ইংরেজরা যে ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছিলেন, তার থেকে কিছু পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছিল গোবিন্দপুরের উক্ত অধিবাসীদের। তারা তালতলা, কুমোরটুলি, শোভাবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি গড়েন। ক্লাইভের মুন্সী নবকৃষ্ণ বাহাদুর এওয়াজিরূপে সুতানুটি ও শোভাবাজারে অনেক জমি

পেয়েছিলেন।

মহারাজ নবকৃষ্ণের বাড়িতে খুব ধুমধাম করে দুর্গাপূজা হত। সমারোহের এই দুর্গাপূজা দেখতে ক্লাইভ ও নবকৃষ্ণের বাড়িতে গিয়েছিলেন—তখন সুতানুটিতে থাকতেন রায়রায়ান মহারাজা রাজবল্লভ। নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস সুতানুটির মধ্যে চড়কডাঙায় বসবাস করতেন। বিডন স্ট্রিট পোস্ট অফিসের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি মানিকতলা স্ট্রিটে এসে মিশেছে—তার নাম এখন রাজা গুরুদাস স্ট্রিট।

কলকাতায় মেয়র কোর্টের কোনও নিজস্ব বাড়ি ছিল না। একটি চ্যারিটি স্কুলের কাছ থেকে মেয়র কোর্টের জন্য বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ভাড়া ছিল ৩০ টাকা। মেয়র কোর্টে যাঁরা বিচার করতেন তারা সবাই ইংরেজ। কাউন্সিলের সভ্যদের মধ্য থেকে তাদের নিয়োগ করা হত। চ্যারিটি স্কুলের কাছ থেকে নেওয়া বাড়িটি চার্চ কর্তৃপক্ষ সেটি পেয়েছিলেন দানসূত্রে উমিচাঁদের কাছ থেকে। মেয়র কোর্টের বিচারকদের বলা হত অল্ডারম্যান। যদিও অল্ডারম্যানরা বিচারের কাজে আগ্রহী ছিলেন না। অনেকেই তাদের মধ্যে প্রায়ই কাছারিতে অনুপস্থিত থাকতেন। এমনকি, বিচারে নির্দিষ্ট সময়ে অনেককে পাওয়া যেত না। এসব দেখে কোম্পানি ফতোয়া জারি করে ঘোষণা করেছিল—যদি কোনও নির্বাচিত অল্ডারম্যান তাঁদের কাজে অবহেলা করেন, তবে তাঁকে ৫০ পাউন্ড জরিমানা দিতে হবে।

১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধের চার বছর আগে অর্থাৎ ১৭৫৩ সালে মেয়র কোর্টের খরচের একটা হিসাব পাওয়া যায়। তা ছিল মোটামুটি এরকম—

(১) মেয়র কোর্টের জন্য ৩০ টাকা হিসাবে ৪ মাসের বাড়ি-ভাড়া—১২৯।।১০

(২) অল্ডারম্যান সাহেবের বিচার পরিচ্ছদ বা গাউন তৈরির জন্য কাপড় খরিদ—১২।৯১৫

(৩) আদালতের হুকুমানুসারে আদালতে ব্যবহৃত সমস্ত সেরেস্তার নকল রাখার জন্য মুহুরির মজুরি ৬৪।।

(৪) মোমজামা কাপড়ের জন্য—১৲

(৫) অল্ডারম্যান সাহেবের বিচারাসনের জন্য ভেলভেট কেনার খরচ—৩৭।৫

(৬) দোভাষীর বেতন—২০

(৭) আদালতে পাহারার জন্য দুজন এদেশীয় জমাদার—৪।১০

(৮) দু'জন অল্ডারম্যানের পকেট খরচ—৩০৲

(৯) দু'জন ইউরোপীয় কোর্ট-সার্জেন্ট ১০ টাকা হিসাবে—২০

(১০) আলোর জন্য মোমবাতি কেনার খরচ (ছ'মাসের) ৩।০

(১১) একজন ব্রাহ্মণের খরচ—৩।০

(১২) একজন মেয়রের খরচ—১৲

মেয়র কোর্টের ফোলিও বইতে মোকদ্দমার বিবরণ রেজিস্ট্রি করার জন্য প্রতি পৃষ্ঠার জন্য ১১।০ ফি নেওয়া হত। এই ফি থেকে বছরে কমবেশি ১৬০০ টাকা আয় হত।

ভারতীয়দের মধ্যে সম্পত্তির বিষয়ে মামলার নিষ্পত্তির জন্য দেওয়ানি আদালত চালু হয় ১৭৫৮ সালে। আদেশ জারি করে বলা হয়েছিল—এই দেশীয়দের মধ্যে দেনা-পাওনা ঘটিত কুড়ি (২০) টাকার উপর দাবিভুক্ত যেসব মামলা দায়ের হবে, সেসব মামলার বিচার করার জন্য পাঁচজন ইংরেজ বিচারককে নিযুক্ত করা হবে। এদের মধ্যে একজনকে প্রধান জজ হিসাবে একবছরের জন্য নির্বাচিত করা হবে। দেওয়ানি আদালতে জজদের নিযুক্ত করবেন গভর্নর সাহেব—কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ করে। প্রয়োজনে কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ করে গভর্নর সাহেব জজদের বরখাস্ত করতে পারবেন।

তখন ফৌজদারি বিধি ব্যবস্থায় বেত্রাঘাতের নিয়ম প্রচলিত ছিল। বেত্রাঘাতের অপর নাম ছিল 'চাবুক লাগানো'। সাধারণতঃ বেত্রাঘাত করা হত প্রতি শুক্রবার।

মহারাজ নবকৃষ্ণ ছিলেন ক্লাইভের স্নেহধন্য। তিনি তাঁর মুন্সী নবকৃষ্ণকে কোম্পানির কাছে সুপারিশ করেছিলেন এই বলে—''নবকৃষ্ণ অতিশয় পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী কর্মচারী।'' লর্ড ক্লাইভের সুপারিশে নবকৃষ্ণকে মাসিক দুশো টাকা মাইনে দিয়ে কোম্পানির 'পলিটিক্যাল বেনিয়ান' পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। নবকৃষ্ণ চিরদিনই নন্দকুমারকে হিংসা করতেন। নবকৃষ্ণ কোম্পানির পারসি বিভাগেরও সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলেন।

পলাশি যুদ্ধের পর মীরজাফর, মীরকাশিম প্রভৃতি যেসব নবাব বাংলার মসনদে বসেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ইংরেজের সহায়তায় বসেছিলেন। ক্লাইভ সহায় না হলে মীরজাফর বেশিদিন রাজত্ব করতে পারতেন না। মীরকাশিমের সঙ্গে কোম্পানির নানা বিষয়ে বিবাদ বাধায়—তাঁকে পাটনায় হত্যা করা হয়েছিল। এরপর বাংলায় শাসনতন্ত্রের পট পরিবর্তন হয়েছিল।

বাংলার দেওয়ানি সনদ পেয়ে ইংরেজরা বাংলার বুকে চেপে বসলেন। বাংলা, বিহার ও ওড়িশ্যার জায়গীর পেয়ে গেল। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করে ক্লাইভ বাংলায় ইংরেজ শাসন কায়েম করে স্বদেশে ফিরে গেলেন। এসময় ভারতে চরম বিশৃঙ্খলা চলছিল। বিলাতের কর্তাদের কাছেও এখবর পৌঁছে গিয়েছিল। বিশৃঙ্খলা প্রতিকারার্থে হেস্টিংসকে বাংলায় গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হল। বছরে তাকে

দেওয়া হত আড়াই লাখ টাকা। তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রণাসভার সৃষ্টি করা হয়েছিল। তার কয়েকজন সদস্যকে বিলাত থেকে পাঠানো হল।

বিচার-বিভাগে শৃঙ্খলা আনার জন্য কলকাতায় প্রধান বিচারালয় বা সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। ১৭৭৪ সালের পর হেস্টিংসের কাউন্সিলের সদস্যদের সঙ্গে নন্দকুমারের পরিচয় হয়েছিল। কাউন্সিলে হেস্টিংসের বিরুদ্ধচারীরা নন্দকুমারের পারদর্শিকতা বুঝতে পেরে তাঁকে হেস্টিংসের অবিচার ও অত্যাচারের বিবরণ সংগ্রহের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ একত্র করে এক আবেদনপত্র তৈরি করে—সেই আবেদনপত্র কাউন্সিলের সদস্য ফ্রান্সিসের হাতে প্রদান করেছিলেন। হেস্টিংসের কাছেও এখবর পৌঁছে গেল। তিনিও নন্দকুমারের সর্বনাশের জন্য নানা উপায় অবলম্বনের উদ্যোগ নিতে শুরু করেন।

বর্ধমানের রাজস্ব আদায় নিয়ে রেসিডেন্ট মি. গ্রাহামের সঙ্গে নন্দকুমারের আগে থেকেই মতান্তর চলছিল। পলাশির যুদ্ধের পর মীরজাফর বাংলার সিংহাসনে বসার পর নন্দকুমার ক্লাইভের দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন। দেওয়ানরূপে নন্দকুমার অসামান্য দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখানোয় তিনি ইংরেজদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর প্রতিপত্তি এত বেড়ে উঠেছিল যে সাধারণ লোক তাঁকে 'কালাকর্নেল' বলতে শুরু করেছিলেন। ক্লাইভের অনুকম্পায় নদীয়া ও বর্ধমানের তহ্‌শীলদারের পদ পেলেও এক বিশেষ কারণে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এসময় নবাব মীরজাফরের খুব অর্থকষ্ট চলছিল। তিনি কেবলই আর্থিক সাহায্য চাইছিলেন রাজা রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠের কাছে। তাঁরাও ক্রমাগত মীরজাফরকে আর্থিক সাহায্য দিতে চাইছিলেন না। হঠাৎই নবাবপুত্র মীরন রায়দুর্লভের কাছে ঢাকা বিভাগের হিসাবপত্র পেশ করতে বললেন। সবদিকের চাপে রায়দুর্লভ নন্দকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ঘটনা জানতে পেরে নবাব দারুণ অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রতিকূল অবস্থায় নন্দকুমার ইংরেজদের প্রকৃত অবস্থা জানালেন। ইংরেজদের আনুকূল্যে নবাব নন্দকুমারের কোনও ক্ষতি করতে না পারলেও প্রতিটি কাজের দোষ ধরতে লাগলেন। ক্রমে উত্যক্ত হয়ে নন্দকুমার নবাবের চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন।

ক্লাইভের পর কলকাতার গভর্নর হয়ে আসেন ভ্যান্সিটার্ট। তিনি প্রথমদিকে নন্দকুমারকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন, কিন্তু হেস্টিংসের প্ররোচনায় ধীরে ধীরে নন্দকুমারের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতে লাগলেন। এসময় নবাবের পদে মীরজাফরকে সরিয়ে মীরকাশিমকে সিংহাসনে বসানো হয়। মীরজাফর পদচ্যুত

হয়ে কলকাতায় আলিপুরে এসে বসবাস করতে লাগলেন নন্দকুমারের আশ্রয়েই পূর্ব বিদ্বেষ ভুলে। কিন্তু নানা কারণে নন্দকুমারের ক্ষমতা লোপ পাচ্ছিল। ইংরেজ কর্তারাও তাঁকে অবিশ্বাসের চোখে দেখছিলেন।

নন্দকুমার তাঁর অবস্থানটা বুঝতে পারছিলেন। তিনি পুনরায় মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাবার জন্য বিহার প্রবাসী শাহ্ আলমের সঙ্গে অতি গোপনে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ষড়যন্ত্রের একটি চিঠি ইংরেজদের হস্তগত হল। স্বভাবতই ভ্যান্সিটার্টের আদেশে নন্দকুমারের বাড়ি খানা-তল্লাশি করা হল। কয়েকটি গোপন চিঠি পাওয়া গেল। যদিও নন্দকুমার এ যাত্রা বেঁচে গেলেন।

'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' থেকে জানা যায় নবকৃষ্ণ নন্দকুমারের ক্রমেই শত্রু হয়ে উঠছিলেন। একজায়গায় লেখা হয়েছিল, "ক্লাইভ নন্দকুমারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, সে সময়ে নবকৃষ্ণ তাঁহার অধীনতায় সামান্য মুন্সীগিরি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমারের এত সম্মান তাহার প্রাণে সহ্য হইবে কেন? উহার পর অবধি তিনি ইংরেজ দিগের চক্ষুশূল হইয়া উঠেন, তখন হইতে নবকৃষ্ণ তাঁহার নিন্দা করিয়া ইংরেজ মহলে আপনার প্রতিপত্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারই পরামর্শ ক্রমে ইংরেজরা নন্দকুমারের উপর মহা ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ক্রমে নন্দকুমারের পতন হইলে, নবকৃষ্ণ বাঙালিদিগের মধ্যে ক্ষমতাবান হইয়া উঠেন। যথেষ্ট অর্থ ও নানাবিধ পদের ক্ষমতালাভ করিয়া তিনি দেশের লোকের উপর স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সকলে আসিয়া নন্দকুমারের আশ্রয় লয়।"

'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র অপরাংশে লেখা হইয়াছিল—"নবকৃষ্ণের উৎকোচ গ্রহণ ও গৃহস্থের পরিবারবর্গের সতীত্বনাশ প্রভৃতির দ্বারা নিন্দনীয় হইয়া উঠেন, অন্তত এই মর্মে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়। যদিও তৎকালে ইংরেজদিগের প্রিয়পাত্র নবকৃষ্ণ উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, তথাপি সাধারণ লোকের মনে সে সমস্ত অভিযোগ একেবারে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় নাই।"

'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র গ্রন্থকর্তা ১৭৭২ সালে ২৮ জুলাই নন্দকুমার সম্বন্ধে হেস্টিংসের অভিমত যেরকম ছিল তার সারাংশ উদ্ধৃত করলেই নন্দকুমারের দোষগুণ উপলব্ধি করতে কষ্ট হবে না। হেস্টিংস পরের দিকে যখন নন্দকুমারকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন—তখন তাঁর অভিমত ছিল—নন্দকুমার প্রভু-ভক্ত কর্মচারী। নিজেকে প্রায় মন্ত্রী ভেবে প্রভুর কল্যাণের বা ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য বিদেশিদের সাহায্য প্রার্থনা করে ইংরেজ কোম্পানির শক্তি কামনার চেষ্টা

করেছিলেন। নবাব মীরজাফর নন্দকুমারকে যথেষ্ট বিশ্বাস করতেন। তিনি কখনওই তাঁকে কোনও কাজের জন্য দোষ দেননি। বরং, তাঁর রাজত্বের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নন্দকুমারকে রাজসম্মানে সম্মানিত করেছিলেন।

নন্দকুমার ছিলেন উচ্চ-ব্রাহ্মণ। অন্যদিকে নবকৃষ্ণ ছিলেন হীনকায়স্থ। তিনি এক সময় নন্দকুমারের অধীনে কাজ করতেন। নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ পত্নীদের সতীত্বনাশের অভিযোগ ছিল নন্দকুমারের। নবকৃষ্ণের চরিত্রে আলোকপাত করতে গিয়ে তাঁর এক আত্মীয় একটি বইতে লিখেছিলেন—"তাঁহার ৭টি স্ত্রী (মি. এন. ঘোষের মতে ৬টি) বর্তমান থাকিলেও তাঁহার বিরুদ্ধে ইন্দ্রিয় দোষের কথা যথেষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। ক্লাইভেরও ওই দোষ বড় কম ছিল না, কাহার সদগুণে কে এ বিষয়ে গুণবান হয়—তাহা আমরা জ্ঞাত নাহি।"

যতদূর জানা—নবকৃষ্ণ নিজের প্রখর বুদ্ধিতে ক্লাইভের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। ১৭৬৭ সালের ১৬ জানুয়ারি বিশেষ সভার বিবরণ থেকে জানা যায়—মুন্সী নবকৃষ্ণকে তাঁর পরিশ্রম ও বিশ্বাসের পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল কোম্পানির পলিটিক্যাল বেনিয়ানের পদ। তিনি নিজের স্বার্থে একটি চাল চেলেছিলেন। যখন নন্দকুমারকে বিহার প্রবাসী দিল্লির সম্রাটের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে বন্দি করে জেনারেল কর্নাক তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তখন কিন্তু নবকৃষ্ণের অনুরোধে ক্লাইভ নন্দকুমারকে চট্টগ্রামে নির্বাসিত করার সংকল্প পরিত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য ক্লাইভের কাছে নন্দকুমারকে ভ্যান্সিটার্টের আরোপিত কয়েকটি নির্দেশ বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছিল।

কার্টিয়ারের, শাসনকালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় মুর্শিদাবাদের নবাব দেওয়ান মহঃ রেজা খাঁ ও অন্যান্য কয়েকজনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ নন্দকুমার নিজের খরচে বিলাতে এজেন্ট পাঠিয়ে সর্বপ্রথম বিচারাধীন করেছিলেন। তখন ছিল হেস্টিংসের শাসনকাল। রেজা খাঁ সে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য হেস্টিংসকে দশলক্ষ ও নন্দকুমারকে দু'লক্ষ টাকা উৎকোচ দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনও অজানা কারণে বিচারে কারও দণ্ড হল না। রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের মুক্তির আদেশ হলেও উলটে নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

বিলেতের কর্তৃপক্ষ হেস্টিংস সম্ভবত জানিয়ে ছিলেন—নন্দকুমার রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের বিরুদ্ধে সঠিক অভিযোগ আনেননি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই নন্দকুমারের কাছ থেকেই তাঁর পুত্রের 'দেওয়ানি' পাইয়ে দেওয়ার জন্য লক্ষ টাকা নজরানা নিয়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। হেস্টিংসের শাসনকালে উৎকোচ ছাড়া কোনও বড় পদ পাওয়া কঠিন ছিল।

নাবালককে নবাবের সিংহাসনে বসাবার জন্য তার নিজের মাকে অভিভাবক না করে বিমাতা মণিবেগমকে নাবালকের অভিভাবক করে দেওয়া হয়েছিল। এই অভিভাবকত্ব পাওয়ার জন্য মণিবেগমকে নন্দকুমারের মারফত হেস্টিংসকে আড়াই লক্ষ টাকা উৎকোচ দিতে হয়েছিল বলে শোনা যায়।

নন্দকুমারের বেশ কিছু গুণ থাকলেও তিনি অসৎ কাজও কম করেননি। নিজের স্বার্থ তিনি ভালোই বুঝতেন। ইতিহাস আলোচনা করলে বোঝা যায়—রাজনৈতিক খেলায় মহারাজ নন্দকুমার ভালো খেলোয়াড় ছিলেন।

দুই

নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ হয়েছিল ১৭৭৫ সালের ৫ আগস্ট। তিনি 'মহারাজা' উপাধি পেয়েছিলেন নবাব মীরজাফরের আনুকূল্যে। তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হওয়ায়—সাধারণ মানুষকে সাহায্য করায় হিন্দু-সম্প্রদায় তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। নন্দকুমারের ক্ষমতাও অসীম হয়ে উঠেছিল। তিনি স্যার ফ্রান্সিসের সহায়তায় হেস্টিংসের বিরুদ্ধে কাউন্সিলের কাজে হেস্টিংসের নামে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ করেছিলেন। তা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে জাল করার অভিযোগে এক মোকদ্দমা আনা হয়। মামলার বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। এই ফাঁসির আদেশে বহু বাঙালি মর্মাহত হয়েছিলেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা গুপ্তভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবসা চালিয়ে কোম্পানির যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতি করছিলেন। কর্মচারীদের এই ব্যক্তিগত ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কয়েকটি চিঠি নন্দকুমারের হাতে এসে গিয়েছিল। তিনিও ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। বদলা নেওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। হস্তগত চিঠিগুলি নিয়ে তিনি কাউন্সিলে উপস্থাপিত করেন। এতে বহু ইংরেজ আমলা নন্দকুমারের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এইসব ঘটনায় কোম্পানির কর্মচারী মহল দু'ভাগে ভাগ হয়েছিল। একদলে হেস্টিংস ও ভ্যান্সিটার্ট এবং অন্যদলে অমিয়ট ও এলিস। বিহারের গোলমাল মিটাবার জন্য কর্নেল কুটকে পাটনায় পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়। কুট অমিয়ট ও এলিসের পরামর্শে নন্দকুমারকে তাঁর প্রধান কর্মচারী হিসাবে পাটনায় নিয়ে যান।

নন্দকুমারের ইচ্ছা ছিল স্বাধীনচেতা নবাব মীরকাশিমকে যথাযথ পরামর্শ দিয়ে তাঁকে ইংরেজ দমনে কাজে লাগাবেন। কিন্তু নবাব মীরকাশিম নন্দকুমারকে বিশ্বাস করে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতে পারলেন না। এই সময় 'রামচরণ রায়' স্বাক্ষরিত কয়েকটি গুপ্তলিপি আবিষ্কার হওয়াতে নন্দকুমার আবার ইংরেজের সন্দেহভাজন হয়ে পড়েন। এই সব চিঠিপত্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস ছিল।

এসময় তিনি ইংরেজদের নজরবন্দি হয়ে পড়েন।

এর অল্পদিনের মধ্যেই মীরকাশিমের পতনের পর, মীরজাফরকে পুনরায় যখন নবাব-সিংহাসনে বসানো হয়, তখন তিনি নন্দকুমারকে নিজের দেওয়ান নিযুক্ত করার অভিলাষ পোষণ করেন। ইংরেজ কর্তারা প্রথমে এই প্রস্তাবে আপত্তি জানালেও অবশেষে নবাবের অনুরোধে সম্মত হয়।

সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি হওয়ার পর নবাব মীরজাফর বাদশাহের কাছ থেকে 'মহারাজা' উপাধি আনিয়ে নন্দকুমারকে তা প্রদান করেছিলেন। নন্দকুমার 'মহারাজ' হয়ে রাজস্ব আদায়ের যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। তাঁর বিহারে অবস্থানকালে কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের একটি গুপ্ত চিঠি ইংরেজরা ঘটনাচক্রে ধরে ফেলেছিলেন। তা থেকে জানা গিয়েছিল যে, নন্দকুমার বাদশাহের সাহায্যে ইংরেজদের ক্ষতির চেষ্টা করছিলেন এবং কাশীরাজ এ ব্যাপারে মধ্যস্থতার ভূমিকায় ছিলেন। এরপর প্রায় দু'বছর ধরে নবাবের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নন্দকুমার ইংরেজের সঙ্গে বিস্তর বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। তিনি সাহসী ছিলেন। ইংরেজদের কথায় ওঠা-বসা করতেন না। নন্দকুমারের মনোভাবে ইংরেজরা ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। অবশেষে ১৭৬৫ সালে মীরজাফরের মৃত্যু হলে নন্দকুমারের ইংরেজের সঙ্গে অনেকটাই সুসম্পর্কের বাতাবরণ তৈরি হয়। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তার পুত্র নজমদ্দৌলা নবাবি পেয়ে মহারাজ নন্দকুমারকে দেওয়ান নিযুক্ত করার জন্য ক্লাইভকে অনুরোধ করেন। ইচ্ছা থাকলেও নবাবের অনুরোধ রাখা সম্ভব হয়নি। ভ্যান্সিটার্টের তীব্র মন্তব্য পর্যালোচনা করার পর নন্দকুমারকে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর জায়গায় মহম্মদ রেজা খাঁ নায়েব সুবাদার নিযুক্ত হলেন। এসময় দ্বিতীয়বার ক্লাইভ গভর্নর হয়ে এসেছিলেন। তিনি নন্দকুমারকে চট্টগ্রামে নির্বাসিত করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। যদিও তাঁকে এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল।

এরপরেই ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাদশাহের কাজ থেকে বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। এই তিন প্রদেশের দেওয়ানি পেলেও কোম্পানির প্রতিনিধিরূপে রেজা খাঁকেই নায়েব দেওয়ান করে দেওয়া হল। রেজা খাঁ মুসলমান সমাজের উপর বড়ই আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। অন্যদিকে মহারাজা নন্দকুমার হিন্দুসমাজের সর্বসম্মত নেতা ছিলেন। সর্বপদ হারিয়ে তিনি কলকাতায় বাস করছিলেন। ক্লাইভের কাছে ভ্যান্সিটার্টের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জমা হয়েছিল। ক্লাইভ নন্দকুমারকে ভ্যান্সিটার্টের শাসনের উপর যথাযথ একটি বিবরণী লিখতে অনুরোধ করলেন। নন্দকুমারও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি সবকিছু

অনুসন্ধান করে ভ্যান্সিটার্টের শাসনকার্য নিয়ে একটি বিবরণী পেশ করলেন ক্লাইভের কাছে। রিপোর্ট যথাযথ ভেবে তা নিয়ে স্বদেশে গেলেন ক্লাইভ। নন্দকুমারের বিবরণী ক্লাইভের খুবই কাজে লেগেছিল।

ক্লাইভের পর বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন ভেরেলস্ট। নন্দকুমারের সঙ্গে তাঁর ভালোই সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মহারাজা নবকৃষ্ণ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে শত্রুতা আরম্ভ করলেন নানা কায়দায়। নন্দকুমার দেশের একজন ক্ষমতাবান ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হয়ে উঠছিলেন। নবকৃষ্ণ খুব ধনী হওয়া সত্ত্বেও সমাজে বিন্দুমাত্র আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি। স্বভাবতঃই নন্দকুমারের জনপ্রিয়তায় নবকৃষ্ণের মনে বিদ্বেষ জন্মেছিল। প্রচুর ধন সংগ্রহ করায় তিনি অত্যাচারিত হয়ে উঠছিলেন। অত্যাচারিতরা নন্দকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলেন ফলে নবকৃষ্ণের ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

১৭৬৯ সালে কার্টিয়ার বঙ্গদেশের গভর্নর হয়ে আসেন। তাঁর সময়েই "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" আরম্ভ হয়। এসময়ে নায়েব-দেওয়ান দেশের লোকের উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করেন। এই দুর্ভিক্ষের সময় নায়েব-দেওয়ান বাজারের সব চাল কিনে তা বেশি দামে বিক্রি করছিলেন। এছাড়াও সরকারি তহবিল থেকে বহু অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন।

নন্দকুমার রেজা খাঁর অন্যায় ও অনভিপ্রেত কাজকর্ম সহ্য করতে না পেরে প্রজাদের কষ্টে কাতর হয়ে নিজের খরচে বিলেতে একজন এজেন্ট পাঠিয়ে বিলেতের কর্তৃপক্ষ (ডাইরেক্টর)-কে রেজা খাঁর ক্রিয়াকলাপ অবহিত করালেন। সবকিছু অবগত হয়ে কর্তৃপক্ষ হেস্টিংসকে নির্দেশ পাঠালেন তিনি যেন নন্দকুমারের সাহায্যে রেজা খাঁর বিচার করেন। বিলাতের নির্দেশে হেস্টিংস মহম্মদ রেজা খাঁ ও পাটনার শাসনকর্তা রাজা সিতাব রায়কে ধরে আনলেন। বিলেতে শাসনকর্তাদের খুশি করার জন্য নন্দকুমারের উপরই হেস্টিংস রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের বিরুদ্ধে তদন্তের ভার অর্পণ করলেন। নন্দকুমারকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁকে সমগ্র বাংলাদেশের আমীনের পদে নিযুক্ত করার আশ্বাস প্রদান করেছিলেন হেস্টিংস। স্বয়ং গভর্নরের আশ্বাস পেয়ে নন্দকুমার রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের সম্পত্তির তহবিল তছরূপের একটি তালিকা প্রস্তুত করে ফেললেন। তালিকায় দেখা গেল নবাব সরকারের বহু রকমের মূল্যবান রত্নালংকার, হাতি, ঘোড়া এবং ১১৭২ থেকে ১১৭৮ সাল পর্যন্ত ছয় বছরের বাংলা ও ঢাকার রাজস্ব থেকে ২০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। মন্বন্তরের সময় বাজারের পুরো চাল কিনে চড়া দামে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করেছেন। তাছাড়া, হুগলির ফৌজদার

রেয়াজউদ্দিন মহম্মদ খাঁ ও শ্রীহট্টের ফৌজদার মহম্মদ আলি খাঁ কোম্পানির কাছে প্রায় এক লক্ষ টাকার ঋণী ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি কোম্পানিকে না দিয়ে, রেজা খাঁ নিজে ক্রোক করে ভোগদখল করছেন। সিতাব রায় কম-বেশি ৯০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে কোম্পানির ক্ষতিসাধন করেছেন। নন্দকুমার তাঁর এসব অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য বহু গণ্যমান্য সাক্ষীদের জোগাড় করেছিলেন।

অবস্থা বুঝে এবং নিজেদের বাঁচাতে মহম্মদ রেজা খাঁ হেস্টিংসকে দশ লক্ষ ও নন্দকুমারকে দু'লক্ষ টাকা এবং সিতাব রায় হেস্টিংসকে চার লক্ষ টাকা উৎকোচ নিতে অনুরোধ করেন। যদিও কেউই এই উৎকোচ গ্রহণ করেননি।

এর কিছুদিন পরেই নজমদ্দৌলার নাবালক পুত্র মোবারকদ্দৌলা সিংহাসনে বসলে তার অভিভাবকত্বের জন্য তার মা বহুবেগম ও তাঁর বিমাতা মণিবেগম উভয়েই আবেদন জানিয়েছিলেন। মণিবেগম মোবারকদ্দৌলার অভিভাবকত্ব পাওয়ার জন্য নন্দকুমারের মাধ্যমে হেস্টিংসকে আড়াই লক্ষ টাকা উৎকোচ দিতে চেয়েছিলেন। নন্দকুমার এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন। হেস্টিংসকে এক লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়ে মণিবেগমকে মোবারকউদ্দোলার অভিভাবকত্ব পাইয়ে দিলেন নন্দকুমার। আর নিজপুত্র গুরুদাসকে দেওয়ানের পদ পাইয়ে দিলেন।

নন্দকুমারের চরিত্রে দ্বিচারিতার সন্ধান পাওয়া যায়। কোনও সময় তিনি অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে স্বয়ং গভর্নরের বিরুদ্ধে নিজের খরচে নালিশ জানাতে বিলেতে এজেন্ট পাঠাচ্ছেন—আবার কখনও উৎকোচ দিয়ে হেস্টিংসের কাছ থেকেই নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য উদগ্রীব হতেন। তাঁর সমগ্র জীবনধারা অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, তিনি প্রচণ্ড রকমের ক্ষমতালোভী ছিলেন।

দু'বছর বিচার চলার পর মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায় নির্দোষ প্রমাণিত হন। কিন্তু হেস্টিংস নন্দকুমারকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন। ১৭৭৪ সালে তিনি একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন বিলেতের কর্তাদের কাছে। মামলার বিবরণ ছাড়াও ওই রিপোর্টে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল শঠতা, প্রবঞ্চকতা, অকৃতজ্ঞতার। বোঝা যায় হেস্টিংস কখনওই নন্দকুমারকে বঙ্গদেশের আমিন পদে বসাতে চাননি—মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলেন। নন্দকুমার কিন্তু তা বুঝতে পারেননি। আনুমানিক ১৭৭৪ সালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ ভারতবর্ষের শাসনকার্য শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালনার জন্য 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করে ছিলেন। এই আইনানুসারে হেস্টিংস হলেন বঙ্গদেশের গভর্নর জেনারেল। তাঁকে সাহায্য করার জন্য জেনারেল ক্লেভারিং, কর্নেল মনসন, ফিলিপ

ফ্রান্সিস ও বারওয়েলদের নিয়ে একটি কাউন্সিল তৈরি করা হল। ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিসের সঙ্গের অহংকারী হেস্টিংসের কোনওদিন সুসম্পর্ক ছিল না।

হেস্টিংসের হাতের পুতুল ছিলেন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা দেবী সিংহ, কৃষ্ণকান্ত নন্দী, মি. গুডল্যান্ড; মহম্মদ রেজা খাঁ ও মহারাজা নবকৃষ্ণ। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য বিরূপ মত প্রকাশ করায়—দেওয়ান, আমিন, নাজির, জমিদাররা অসুবিধায় পড়েছিলেন। হেস্টিংসের একচেটিয়া অনুকম্পায় কোনও কাজ হচ্ছিল না। সবাই নিজের স্বার্থে তাঁকে তোষামোদ করতেন। কাউন্সিলের জন্য হেস্টিংস তোষামোদকারীদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে না পারায় অনেকেই ডিগবাজি খেয়ে নন্দকুমারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। কারণ কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। এতে হেস্টিংস নন্দকুমারের উপর আরও চটে গেলেন।

কিন্তু কাউন্সিল নন্দকুমারকে ভার দিল হেস্টিংসের অবিচার ও অত্যাচারের তথ্য সংগ্রহ করতে। নন্দকুমারও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

হেস্টিংস জানতেন বর্ধমানের রাজস্ব আদায় নিয়ে রেসিডেন্ট মি. গ্রাহামের সঙ্গে নন্দকুমারের মনোমালিন্য আছে—মনোমালিন্য আছে মোহন প্রসাদের। কে এই মোহন প্রসাদ? বোলাকিদাস শেঠ ছিলেন একজন মণিকার। তাঁর মৃত্যুর পর মোহন প্রসাদ ছিলেন তাঁর আম-মোক্তার। মোহন প্রাসাদের সঙ্গে নন্দকুমারের হিসাবপত্র নিয়ে গোলমাল বেঁধেছিল। এছাড়াও একটি বিচিত্র ব্যাপার জানা গেল।

নন্দকুমারের নিজের জামাই ছিলেন কুঞ্জঘাটার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্বশুরমশাইয়ের তুলনায় তাঁর অর্থ, যশ অনেক কম ছিল। এজন্য তিনি হীনম্মন্যতায় ভুগছিলেন এবং বিরূপ ছিলেন নন্দকুমারের প্রতি। হেস্টিংস, মি. গ্রাহাম, মোহন প্রসাদ ও জগচ্চন্দ্রকে হাত করেছিলেন। এর পরেই নন্দকুমার বিরুদ্ধে শুরু হল হেস্টিংসের ষড়যন্ত্র। তাঁর প্রধান শত্রু হয়ে উঠলেন নন্দকুমারের। এবং তাঁকে জব্দ করতে আলাউদ্দিন খাঁ নামে এক শয়তান লোককে জোগাড় করলেন। তাঁকে দিয়ে মিথ্যা মামলা রুজু করালেন নন্দকুমারের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই মামলার অভিযোগ কিছুতেই প্রমাণ করা যাচ্ছিল না। হেস্টিংস নিরাশ হয়ে পড়ছিলেন। নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কমলউদ্দিনের আনীত অভিযোগ মিথ্যায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছিল—তা হেস্টিংসও বুঝতে পারছিলেন।

অনোন্যোপায় হয়ে হেস্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একটি অঙ্গীকারপত্র জাল করার অভিযোগ আনালেন। তখন ইংল্যান্ডের আইন তৃতীয় জর্জের বিধান অনুসারে 'জাল' করার অপরাধের শাস্তি ও 'খুন' করার অপরাধেরও শাস্তি ছিল

ফাঁসি। হেস্টিংস ভালো করেই জানতেন জাল করার অপরাধের শাস্তি। তাই এই ষড়যন্ত্র ফেঁদেছিলেন। এলিজাবেথের বিধানে জাল করার অপরাধের প্রমাণ হলেও ফাঁসির দণ্ড ছিল না। এই কারণেই—বোধহয় কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি চেম্বার্স 'জাল করা' অভিযোগের বিচার করতে চেয়েছিলেন এলিজাবেথের বিধান অনুসারে। তাঁর অভিমত নন্দকুমারের বিচারের সময় অনুসরণ করতে রাজি হননি প্রধান বিচারপতি স্যার ইলিজা ইম্পে। বোঝাই যাচ্ছিল হেস্টিংসের পরিকল্পনা। নন্দকুমারের বিচার হয়েছিল ইংল্যান্ডের তৃতীয় জর্জের বিধান অনুসারে। ইম্পে ছিলেন হেস্টিংসের সহায়। বিচারের বাণী যে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে যাবে তাও বোঝা গিয়েছিল নানা ঘটনায়।

মীরকাশিমের আমল থেকেই জহুরি বোলাকিদাসের কারবার ছিল। তাঁর সঙ্গে নন্দকুমারের সম্পর্ক প্রথম দিকে ভালো ছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে নন্দকুমারকে ঠকানোয় পরে সম্পর্কের অবনতি হয়। নন্দকুমার একছড়া মুক্তার হার, একটি কল্কা, একটি শির প্যাঁচ ও একটি হিরের আংটি বোলাকিদাসকে বিক্রি করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় কাশিমবাজার লুঠ হওয়ায় বোলাকিদাসের বক্তব্য ছিল নিজের স্বর্ণালংকারের সঙ্গে নন্দকুমারের গয়নাগুলিও লুঠ হয়ে গিয়েছে। তবুও বোলাকিদাস গয়নাগুলির মূল্যবাবদ ৪৮০০২১ টাকা দিতে অঙ্গীকারপত্র লিখে দেন। এবং তা তিনি নন্দকুমারের হাতে তুলেও দেন।

কোম্পানির কাছে বোলাকিদাসের দু'লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর কোম্পানির কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা আদায় হয়েছিল। বোলাকির তত্ত্বাবধায়ক পদ্মমোহন দাস নন্দকুমারের প্রাপ্য টাকাও পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। পদ্মমোহনের মৃত্যুর পর বোলাকিদাসের এক আত্মীয়—গঙ্গাবিষ্ণু এই সব লেনদেনের হিসাব নিয়ে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একটি দেওয়ানি মামলা রুজু করেন। দেওয়ানি মামলার রায় কিন্তু নন্দকুমারের পক্ষে গিয়েছিল—পূর্বের সেই অঙ্গীকারপত্র মামলায় দাখিল করায়।

হেস্টিংস জেনেছিলেন গঙ্গাবিষ্ণুর দায়ের করা দেওয়ানি মামলার কথা, বোলাকিদাসের অঙ্গীকারপত্রের কথা এবং পদ্মমোহনের টাকা পরিশোধের কথা। তিনি যেন হাতে তুরুপের তাস পেয়ে গেলেন। বোলাকির আম-মোক্তার ছিলেন মোহন প্রসাদ। হেস্টিংস তাঁকে হাত করলেন। তাঁকে দিয়ে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে বোলাকিদাসের মোহর লাগানো অঙ্গীকারপত্র জাল করার দাবিতে একটি অভিযোগ আনা হল ১৭৭৫ সালের ৬ মে। অভিযোগটি দায়ের করার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা তদানীন্তন শেরিফ মি. ম্যাক্রেবিকে আদেশ দিলেন

নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করে আনার। নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করা হল। তাঁকে শুধু কারারুদ্ধই করা হল না, তাঁকে একজন সাধারণ কয়েদির মতো রাখা হল।

সাধারণ মানুষ আন্দোলনে ফেটে পড়লেন। তবে বিচারপতিদের উপর কোনও প্রভাব এতে পড়েনি। দেশের মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন তিনি গভর্নরের শিকার। তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

শুরু হল সেই ঐতিহাসিক বিচার। ১৭৭৫ সালের ৮ জুন। ৯ জুন মূল বিচার আরম্ভ হল সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি ইলিজা ইম্পে, স্যার রবার্ট চেম্বার্স, স্টিফেন সিজার লিমেস্টার ও জন হাইড ছিলেন বিচারকমণ্ডলীতে। এছাড়াও ১২ জন জুরি। বেশ কয়েকদিন সাক্ষ্যগ্রহণ হল। সাজানো সাক্ষীর সাক্ষ্য তাই বিচারের রায় কী হবে তা অনুমান করা গিয়েছিল। অবশেষে ১৫ জুন রাতে দেওয়া হল রায়। নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ হল।

প্রাণদণ্ডের আদেশের পরেও মহারাজকে ২২দিন যাবৎ কারাগারের একটি দোতলা ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল।

নবাব মোবারকদ্দৌলা কাউন্সিলের কাছে নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি কাউন্সিলকে অনুরোধ করেছিলেন ইংল্যান্ডের কর্তাদের কাছে যেন অনুরোধপত্রটি পাঠানো হয়। যতদিন পর্যন্ত না তাঁর আবেদনের উত্তর আসে, ততদিন যেন নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা না হয়। আবেদন জানালে কী হবে? নবাবের অনুরোধের প্রতি কোনও ভ্রূক্ষেপ করা হল না। ৫ আগস্ট ১৭৭৫ খিদিরপুরের কাছে কুলি বাজারে (আধুনিক হেস্টিংসে) মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়ে গেল।

শোনা যায়, মিথ্যা মামলায় নন্দকুমারের ফাঁসি হওয়ায় কলকাতার বহু নামজাদা ব্রাহ্মণ কুলপতিরা কলকাতার বাস উঠিয়ে ভীত হয়ে গঙ্গার অপর পাড়ে উঠে গিয়েছিলেন।

১৮১৮ সালে স্বদেশে ওয়ারেন হেস্টিংসের মৃত্যু হয় ডেইলসফোর্ডে।

তিন

নন্দকুমারের ফাঁসির ৫ বছর পর, অর্থাৎ ১৭৮০ সালে 'হিকিজ গেজেট' বা 'বেঙ্গল-গেজেট' নামে একটি ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশ হতে শুরু করল। অবশ্য ১৭৭৪ সালে 'ইন্ডিয়া গেজেট' নামেও একটি ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। নন্দকুমারকে নিয়ে সেই গেজেটে অনেক লেখালেখি হয়েছিল। হিকি সাহেব ছিলেন 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'হিকিজ গেজেট'-এর সম্পাদক। তিনি হেস্টিংস, ইলিজা ইম্পে ও স্যার ফ্রান্সিসের মতো পদস্থ ব্যক্তিদের গালাগালি দিয়েছিলেন। এখনও সেই গেজেটের কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতেও বহুকাল বেঙ্গল-গেজেটের কপি ছিল।

কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চেম্বার্স। তিনি একজন আইনজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। স্যার উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন অবসর নেওয়ার পর চেম্বার্স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক হন। আইনের ব্যাখ্যা তিনি সুনিপুণভাবে করতে পারতেন। তিনি যদি নন্দকুমারের বিচারের সময় একটু শক্ত হতেন তবে হয়তো নন্দকুমার প্রাণে বেঁচে যেতেন। তিনিই বলেছিলেন—নন্দকুমারের সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের আইন অনুসারে বিচার হোক এবং চার্জও গঠন করা হোক। এলিজাবেথের আইনে 'জাল' করার অভিযোগে ফাঁসির বিধান ছিল না।

সম্ভবত পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী তাঁর সহযোগী বিচারপতিরা তাঁর অভিমত গ্রহণ না করে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের আইনানুসারে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে বিচার শুরু করেন। স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য ছিল। চেম্বার্স ভালোমানুষ ছিলেন। তিনি সহযোগীদের সঙ্গে বাদানুবাদে না গিয়ে পরিস্থিতি অনুধাবন করে তাঁদের মতামত মেনে নিয়েছিলেন ও প্রাণদণ্ডের আদেশে স্বাক্ষর কবতে বাধ্য হয়েছিলেন।

স্যার ইম্পের প্রধান শত্রু ছিলেন কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস। তিনি স্বদেশে ফিরে গিয়েও ইম্পের বিরোধিতা করতে ছাড়েন নি। দু'বছর

ইম্পে প্রধান বিচারপতি থাকা সত্ত্বেও সদর দেওয়ানি-জজের চাকুরি নিয়েছিলেন। যদিও তিনি তা মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। এ ব্যাপারে বিলেতের লর্ড চ্যান্সেলর হুলস্থুল সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে ইম্পেকে চাকরি ছাড়তে হয়েছিল এবং তিনি স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর শেষ জীবনটা প্রিয়বন্ধু হেস্টিংসের মতোই দুঃখে কেটেছিল।

১৭৮৭ সালে স্যার গিলবার্ট ইলিয়ট (পরে লর্ড মিন্টো) 'হাউস অব্ কমেন্সে'র কাছে ইম্পেকে 'ইমপিচ' করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ইম্পের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সাবুদ গ্রহণ করা হয়েছিল। বহু বিখ্যাত ব্যক্তিরা ইম্পের বিরুদ্ধে মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। মিঃ টমাস ফারার যিনি নন্দকুমারের মামলায় তাঁর কৌসুলি ছিলেন, ইম্পের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

১৭৮৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইম্পে 'হাউস অব্ কমন্সে'র সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজেই সওয়াল করেছিলেন। শোনা যায় ইম্পের তেজগর্ভ বক্তৃতা ছিল শোনার মতো। সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। শেষপর্যন্ত 'হাউস অব্ কমন্স' তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংসের প্ররোচনায় ইম্পে নন্দকুমারকে ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত করলেও—ইম্পের মধ্যে অনেক সৎগুণ ছিল। তখন নন্দকুমারের বিচার জনগণের কাছে 'ফেয়ার ট্রায়াল' বলে চিহ্নিত হয়নি। বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষত ব্রাহ্মণরা এই বিচারকে প্রহসন বলে মনে করতেন। লর্ড মেকলে ইম্পেকে নররাক্ষস বলে অভিহিত করেছিলেন। আবার, অন্য দিকে বিলাতের প্রখ্যাত আইনজীবী লর্ড ম্যান্সফিল্ড, স্যার হেনরি মেইন, ব্ল্যাকস্টোন প্রথমে ইম্পেকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত করলেও পরে মামলার সমস্ত কাগজপত্র পড়ে ইম্পেকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের বিচারকে কেন্দ্র করে দু'খানি খুব ভালো বই লেখা হয়েছিল। জেমস স্টিফেন লিখেছিলেন 'Story of Nund comer and Impey'। অন্য বইটি ছিল ইতিহাস তত্ত্ববিদের মহাত্মা বেভারিজের 'Trail of Maharaja Nandakumar'. এই বইদুটি পড়লে ইম্পের চরিত্রের দোষগুণ পাওয়া যায়।

'হাউস অব্ কমন্সে'র সামনে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় যে সওয়াল করেছিলেন তা শুনে বিলাতের আইনজ্ঞ, পণ্ডিত লর্ড ম্যান্সফিল্ড ইম্পের সঙ্গে করমর্দন করে বলেছিলেন—"So, sir Elizab you have passed sale over the coals." ইম্পে ভারতে এসে ফারসি পড়তে ও লিখতে শিখেছিলেন। তাঁর দাদামশাই বিলাতে বসে নাদির শাহের জীবনী লিখেছিলেন। ইম্পে পার পেয়ে

গেলেও তাঁর প্রিয়বন্ধু ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর নিজের মামলার জন্য 'পথের ভিখারি' হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও বহুকষ্টে তিনি অব্যাহতি পেয়েছিলেন। ইম্পের শেষজীবন ভালো কাটেনি। সঞ্চিত ধন সুদে বাড়ানোর জন্য তিনি স্বদেশে গিয়ে অনেক টাকার 'ফ্রেঞ্চ বন্ড' কিনেছিলেন। তখন ফরাসি-রাষ্ট্রবিপ্লবে'র জন্য সেই সব বন্ডের দাম খুব কমে যায়। এর ফলে তিনি দীন হয়ে পড়েছিল। অবস্থার বিপাকে তিনি লন্ডনের বাড়ি বিক্রি করে সাসেক্সে 'নিউইক পার্ক' নামে একটি গ্রামে জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। ১৮০৯ সালে ওই গ্রামেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বাঙালির ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম রেখে গিয়েছেন।

বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মহারাজ নন্দকুমারের উপর এত চটা কেন ছিলেন, তার অনেক কারণ ছিল। প্রথমত, হেস্টিংসের শত্রু স্যার ফ্রান্সিসের সঙ্গে নন্দকুমারের খুব দহরম-মহরম ছিল। মনসন ও ক্লেভারিংও নন্দকুমারের সঙ্গে ছিলেন। দ্বিতীয়ত, এইসব বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মদত পেয়ে নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে জাল অভিযোগ বোর্ডের কাছে পেশ করা। তৃতীয়ত, নন্দকুমারের অভিযোগ ছিল মণিবেগম, রেজা খাঁ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে হেস্টিংস উৎকোচ নিয়েছেন। চতুর্থত, নন্দকুমার বোর্ডকে জানিয়েছিলেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষী ও দলিলপত্র মজুদ আছে।

১৭৭৫ সালের ১১ মার্চ নন্দকুমারের দেওয়া চিঠি স্যার ফ্রান্সিস বোর্ডের সভায় পেশ করেছিলেন। নন্দকুমারের প্রস্তাবটি ফ্রান্সিস ভোটাধিক্যে পাস করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন—হেস্টিংস বুঝতে পেরে কাউন্সিল সভা খারিজ করে দেন। হেস্টিংসের সমর্থনকারী বারওয়েল সাহেবও তখনই সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান।

নন্দকুমারের ফাঁসির পর হেস্টিংসের আরও দু'জন (মনসন ও ক্লেভারিং) শত্রুর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়েছিল। ১৭৭৬ সালে মারা যান মনসন ও ১৭৭৭ সালে ক্লেভারিংয়ের মৃত্যু হয়। ১৭৮০ সালে ফ্রান্সিস ক্লেভারিংয়ের মৃত্যু হয়। ১৭৮০ সালে ফ্রান্সিস স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তার কয়েক মাস পূর্বে চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। কাউন্সিলের এক সভায় হেস্টিংস তাঁর চরম শত্রু ফ্রান্সিস সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব পাঠ করে সেই প্রস্তাব সরকারি কনসালটেশানে রেকর্ড করিয়ে নেন। তাঁর বয়ান ছিল—"I do not trust to Mr. Franics promises of condour convinced that he is in capable of it. I judge of his public conduct by his private, which. I have found to be void of truth and honour.

সভা শেষ হতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে তিনি পাশের একটি ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাবের বয়ানে স্যার ফ্রান্সিস নিজেকে অপমানিত বোধ

করেছিলেন। তিনি হেস্টিংসকে ডেকে পাটিয়েছিলেন। তাঁকে 'ডুয়েল' লড়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। হেস্টিংস সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। ১৭৮০ সালের ৭ আগস্ট আলিপুর জেলখানার কাছে সেই ডুয়েল। তাতে ফ্রান্সিসের দক্ষিণঅঙ্গে হেস্টিংসের ছোঁড়া গুলি লেগেছিল এবং তিনি ধরাশায়ী হয়ে পড়েন। সেই বছরের শেষ দিকে ফ্রান্সিস পদত্যাগ করে ইংল্যান্ডে ফিরে যান।

'ডুয়েল' কলকাতায় ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। এতে প্রাণহানিও হচ্ছিল। যিনি ডুয়েলে জয়লাভ করেন, তিনিও খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে পড়ছিলেন। ফলে আদালতের আদেশে অভিযুক্তকে অনেক সময় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছিল।

ফেরা যাক—স্যার ইম্পের একটি চমকপ্রদ মামলার কাহিনীতে। তাঁর এজলাসে একটি মামলা উঠেছিল। ফ্রান্সিসের আলিপুরে একটি পল্লিনিবাস ছিল। বেলভেডিয়ার কাছাকাছি। সেখানে মি. লি. গ্রান্ড নামে একজন ইংরেজ বাস করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন পরমাসুন্দরী। তখনকার দিনে কলকাতায় এত কেতাদুরস্ত সুন্দরী মেলা ভার ছিল। অনেকেই সুন্দরী মহিলাকে দেখে তাঁর সান্নিধ্য পেতে চাইতেন। ফ্রান্সিস এই সুন্দরীর রূপে মোহিত হয়ে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করতে না পেরে একদিন নিশিথ অভিসারে বেরিয়ে পড়েন। একটি দড়ির সহায়তায় তিনি লি. গ্রান্ডের বাড়ির উপরতলায় উঠে গিয়েছিলেন। মি.লি. ঘটনাচক্রে সেদিন বাড়ি ছিলেন না। ফ্রান্সিসকে মিসেস গ্রান্ড তাঁর বিশ্রামকক্ষে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মিসেস গ্রান্ডের চেঁচামেচি শুনে লোকজনের সমাগম দেখে—ধরা পড়ার ভয়ে ফ্রান্সিস সেই দড়ির সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পালিয়ে যান। তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর বন্ধু মি. শী। গ্রান্ডের এক জমাদার মেমসাহেবের চিৎকার শুনে ছুটে এসে মি. শীকে ধরে ফেলে।

গ্রান্ড পরের দিন ফিরে এসে সব ব্যাপারটা জানলাম। এরপর তিনি ফ্রান্সিসকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে (ডুয়েল) আহ্বান জানালেন। ফ্রান্সিস কতকগুলি কারণ দেখিয়ে সেই 'ডুয়েল' এড়িয়ে গেলেন। গ্রান্ড তখন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের কাছে তাঁর স্ত্রীর-মানহানির অভিযোগ দায়ের করলেন। সঙ্গে ক্ষতিপূরণের দাবিও। তাঁর অভিযোগ শুনতে তিন জন বিচারপতি স্যার ইম্পে ছাড়াও ছিলেন—চেম্বার্স ও হাইড। অভিযোগ শোনার পর চেম্বার্স বলেছিলেন যখন প্রকৃত অপরাধের কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, তখন ক্ষতিপূরণের দাবির প্রশ্ন আসতে পারে না। কিন্তু স্যার ইম্পে বলেন—কোনওরূপ অত্যাচারের প্রমাণ না থাকলেও গ্রান্ড-পত্নীর বিশ্রামকক্ষে গভীর রাতে প্রবেশ করে ফ্রান্সিস তাঁর সম্ভ্রমের হানি করেছেন। বিচারপতিদের মধ্যে এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হওয়ায় চেম্বার্স তখন বলতে বাধ্য হলেন বিশ

হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। জজ হাইড বললেন—বিশ হাজার টাকা ইংরেজ মহিলার ইজ্জতের পক্ষে খুবই কম। এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। শেষ অবধি ইম্পে একটা রফা করে দিয়ে বললেন পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এবং সেই প্রস্তাব সবাই মেনে নিলেন।

ইম্পে কলকাতা ত্যাগ করেন ১৭৯১ সালে। আর ইম্পের পর কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে বসেছিলেন চেম্বার্স। ১৭৯৯ সালে চেম্বার্স স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব একটি লাইব্রেরিতে বহু দুষ্প্রাপ্য বই ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ছিল—সেগুলি তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। জানা যায় যে—সেইসব মূল্যবান সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলি পরবর্তী সময়ে বার্লিনের 'রয়াল লাইব্রেরি' উচ্চ দরে কিনে নেয়।

কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট উঠে গিয়ে ১৮৬২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হয়। বিচারব্যবস্থার একটু পিছনের দিকে গেলে দেখা যাবে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বিচারপ্রণালীর যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল তিনি মুর্শিদাবাদে চারটি বিচারবিভাগ ও বিচারালয় স্থাপন করেছিলেন।

(১) নিজামত আদালত

(২) মহকুমা দেওয়ানি আদালত

(৩) কাজির আদালত

(৪) ফৌজদারি আদলত।

ইতিহাস ঘাটতে বসে ১৭৬৬ সালে এক কায়স্থের ফাঁসির ঘটনা চোখে পড়ে। গোবিন্দরাম মিত্র নামে এক ব্যক্তি কলকাতায় বিখ্যাত ছিল। তাঁর পৌত্র রাধাচরণের জাল-অপরাধে বিলেতি আইনানুসারে বিচার হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধেও ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। তখন কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই ফাঁসির আদেশ মুকুব করার জন্য গভর্নরের কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করেছিলেন। তাতে ৯৫৭ জন স্বাক্ষর করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

(১) নবকৃষ্ণ মুন্সী, (২) হুজুরীমল (৩) গোকুল ঘোষ (৪) দয়ারাম ঘোষ (৫) কদর্প ঘোষ (৬) রামচাঁদ ঘোষ (৭) শংকর হালদার (৮) পূর্ণচন্দ্র বসাক (৯) শোভারাম বসাক (১০) রাধামোহন বসাক (১১) দুর্গারাম সেন (১২) নন্দরাম সেন (১৩) দয়ারাম শর্মা (১৪) রামলাল শর্মা (১৫) জয়কৃষ্ণ শর্মা (১৬) উদয়রাম শর্মা (১৭) রাধাকান্ত শর্মা (১৮) রামনিধি শর্মা (১৯) রাধাচরণ মল্লিক (২০) শুকদেব মল্লিক (২১) রাসবিহারী শেঠ (২২) নিমাইচাঁদ শেঠ (২৩) পীতাম্বর শেঠ (২৪) বিনোদবিহারী শেঠ (২৫) গুরুচরণ শেঠ (২৬) নীলাম্বর শেঠ (২৭)

গোকুল কিশোর শেঠ (২৮) কুন্দ ঘোষাল (২৯) বাবুরাম পালিত (৩০) বনমালি ব্যানার্জি (৩১) রাধাকৃষ্ণ মল্লিক (৩২) দয়ারাম মুখোপাধ্যায় (৩৩) মনোহর মুখোপাধ্যায় (৩৪) তোতারাম বসু (৩৫) রামশংকর বসু (৩৬) রামশংকর দত্ত (৩৭) দুর্গারাম দত্ত (৩৮) মদন দত্ত (৩৯) শ্যামচাঁদ দত্ত (৪০) হরিকৃষ্ণ দত্ত (৪১) মানিক দত্ত (৪২) চূড়ামণি দত্ত (৪৩) কৃষ্ণচাঁদ দত্ত (৪৪) রামনিধি ঠাকুর (৪৫) বিশ্বনারায়ণ ঠাকুর (৪৬) দয়ারাম ঠাকুর (৪৭) দুর্গারাম ঠাকুর (৪৮) হরিকৃষ্ণ ঠাকুর (৪৯) শ্যাম চক্রবর্তী (৫০) কেবল রাম ঠাকুর (৫১) রামচরণ রায় (৫২) কৃপারাম মিত্র (৫৩) রাম সুন্দর মিত্র (৫৪) গোবর্ধন মিত্র (৫৫) গণেশ বসু (৫৬) গঙ্গারাম বসু (৫৭) গোকুল মিত্র।

কিন্তু গভর্নর তাঁদের আবেদনে কর্ণপাত করেননি। সেকালে ডাকাতিরও শাস্তি ছিল ফাঁসি। নবাবি আমলের একটি বিচারের নমুনা দেওয়া যেওয়া যেতে পারে।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে দু'জন প্রবল প্রতাপশালী জমিদার বিদ্রোহী হয়েছিলেন। এদের অন্যতম ছিলেন ভূষণার জমিদার সীতারাম রায় অপরজন ছিলেন রাজশাহীর জমিদার রাজা উদয়নারায়ণ। সীতারামের রাজধানী ছিল হরিহর নগরের মধুমতি তীরে। সীতারাম ও উদয়নারায়ণ নবাব মুর্শিদকুলির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছিলেন। (এসময় মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন বাংলার দেওয়ান) ও নাজিম। বিচার ও শাসন বিভাগ—দুই-ই ছিল তাঁর হাতে।

সীতারাম ও উদয়নারায়ণের অভ্যুত্থানের খবর পেয়ে নবাব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। সীতারামকে দমনের জন্য তিনি বক্স আলি খাঁকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করলেন। সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতি প্রতিদিন নগর প্রদক্ষিণ করে বিপক্ষ পক্ষের সবরকম সংবাদ সংগ্রহ করতেন। নগরের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে নিজেই খুব সজাগ থাকতেন। সেদিনও অন্যান্যদিনের মতো নগর প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়েছিলেন। বেইমান দয়ারামের কারসাজি বুঝতে পারেননি প্রধান সেনাপতি, দয়ারামের পরামর্শে, সুবেদারি ফৌজ মেনাহাতিকে আক্রমণ করে শূলবিদ্ধ করেন। মেনাহাতির ছিন্নমস্তক নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

শোনা যায়—নবাব বাহাদুর বীর মেনাহাতির ছিন্ন মস্তক দেখে নাকি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "তোমার মতো বীর সেনানীকে আমি জীবত অবস্থায় দেখতে পেলে বড়ই সুখী হতাম।"

সীতারামকে এরপর বন্দি করে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সীতারামকে নাকি কিছুদিন নাটোরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। কিছুদিন পরে মুর্শির্দকুলি খাঁ সীতারামকে শূলে চড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে ফাঁসি না

দিয়ে শূলে চড়ানো হত। 'তারিখ-ই-বাংলার' মতে বক্স আলি সীতারামকে সপরিবারে শৃঙ্খলকৃত করে মুর্শিদাবাদে নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নবাবের আদেশে তাঁর মুখ চর্মাবৃত করে মুর্শিদাবাদের পূর্বদিকে ঢাকা ও মহম্মদপুর যাওয়ার রাস্তায় শূলবিদ্ধ করা হয়। অন্যান্য জমিদারদের মনে ভয় জন্মানোর জন্য সীতারামের মৃতদেহ একটি গাছে লটকিয়ে দেওয়া হয়। তার শরীরের রক্ত যাতে নীচে না পড়ে সেজন্য একটি পাত্র রাখা হয়েছিল। তাঁর পরিবারের সদস্যদের যাবজ্জীবন মহম্মদাবাদে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।

স্টুয়ার্ট এই ব্যাপার নিয়ে 'স্টুয়ার্ট-বেঙ্গলি' লিখেছিলেন--"Bux Ally Khan seized. Sitaram, his woman, children and accompliees and sent them in irons to Murshidabad, where Sitaram and robbers impaled alive and woman and children sold as slaves."

'রিয়াজ-উস-সালাতিন' এবং 'তারিখ-ই-বাংলা'র মতে—"Murshid quli Khan ordered that Sitaram's head should be enclosed in a new cowhide and after he had been impaled alive his body should be hung on a tree on the high road from Murshidabad to Dhaca so that this might set an example to other zamindars."

এক সময় নবাবি আমলে 'ফাঁসি' দণ্ড না থাকলেও শূলবিদ্ধ করার রেওয়াজ ছিল। জমিদাররাই জমিদারদের প্রধান শত্রু ছিলেন। উদ্দেশ্য নবাব বাহাদুরের অনুকম্পা পাওয়া। ইংরেজ আমলে গভর্নর বা কোম্পানির কর্তাদের অনুকম্পা।

সীতারাম রায়ের মৃত্যু ঘটানো হল শূলবিদ্ধ করে আর মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্যকর করা হল ফাঁসির দড়ি গলায় দিয়ে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও এখনও ইংরেজ আইনের কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ তার আইনি ব্যবস্থা সতেরো ও আঠারো শতক ধরে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে একটির পর একটি মৃত্যুদণ্ডের আইন পাস করা হয়েছিল। তা প্রায় দুশোতে পৌঁছেছিল।

এক সময় ইংল্যান্ডে ভেড়া, ঘোড়া চুরি এবং মুদ্রা জাল করলে প্রাণদণ্ডতো হতই, যে কোনও দোকান থেকে পাঁচ শিলিং মূল্যের জিনিস, অথবা কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে সামান্য একটি রুমাল চুরি করলেই অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। খুনের চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত হলে সামান্য শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু কারও নাক কেটে দিলে ঝুলতে হত ফাঁসিতে। ইংরেজরা নাকি এই সব দণ্ড তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন।

স্যার উইলিয়াম ডনকিন ছিলেন সিডনি জজ। ১৭৯৫ সালের ১ আগস্ট কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের সিঁদ কেটে চুরির অপরাধে ছ'জন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে

দণ্ডিত করেছিলেন। ১০ ডিসেম্বর, ১৮০২ সালে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে ডাকাতির অভিযোগে বিজু মশাল চিকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। অথচ ১৮০৪ সালে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে হত্যাপরাধের জন্য বিভিন্ন মামলায় ম্যাকলকলিনের খুনের অপরাধে অভিযুক্তকে ১টাকা জরিমানা ও একমাস কারাদণ্ডের আদেশ দেন। একই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল মহম্মদ ও ম্যাথু খুনের অপরাধীকে। উইলিয়াম কেরি মন্তব্য করেছিলেন—"Verily the crimes of forgery and theft were considered by the legislators of those days more heineous than that of manslaughter."

১৮০৪ সালে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার এন্সট্রথার। তখনকার বিচারপতিরা চুরিও জালিয়াতিকে মানুষখুনের চেয়ে গুরুতর অপরাধ বলে মনে করতেন। ১৮০৭ সালের ১০ জুন ছুরিমারার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। এবং তাতে বলা হয়েছিল—১৩ জুন শনিবার লালবাজার স্ট্রিটের চৌরাস্তার মোড়ে প্রকাশ্যে অপরাধীকে ফাঁসিতে লটকাতে হবে—"to be executed on saturday the 13th, at the four-roads which meet at the head of LalBazar Street."

১৮০০ সালে একজন এদেশীয় মহিলাকে এক নাবালিকা চাকরানীকে হত্যা করার অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট দিনে চৌরাস্তার মোড়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। সাহেবের বাড়ির ঘড়ি চুরির দায়ে ব্রজমোহন দত্ত নামে এক ব্যক্তিকে লালবাজারে চৌরাস্তার মোড়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে বিচারের নামে অনেক সময়ই প্রহসন হয়েছে। এই প্রহসনের বিচার থেকে নন্দকুমার বা ব্ল্যাক-জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্রের মতো সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও রেহাই পাননি।

এ সময় মেয়রস কোর্ট বসত সেন্ট অ্যান গির্জার চ্যারিটি স্কুলে। স্কুলবাড়িটির নাম সেজন্য 'কোর্ট-হাউস' হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা কিছুকাল এই আদালতগৃহে বিচারে বসেছেন। মহারাজা নন্দকুমারও বিচারের জন্য এখানেই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন।

১৭৭০ সালের কাছাকাছি লালবাজারে যে জেলখানাটি ছিল—তার ভিতরে ঘাট-হাত চৌকা একটি পুকুর ছিল। পুকুরের পাশে ছোট ছোট হোগলার ঘর তৈরি করে সাহেব কয়েদিদের থাকতে দেওয়া হত। তাদের অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এই জেলখানাতেই নন্দকুমার তাঁর বিচারের সময় বন্দি ছিলেন। সেকালে কলকাতা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কাছে একটা

কথা সর্বদা শোনা যেত— "জাল-জুয়াচুরি-মিথ্যাকথা এই তিন নিয়ে কলিকাতা"। অনেকেরই অভিমত ছিল—ইংরেজ কোম্পানির আমলের প্রথমাবস্থায় যে বিচারের মানদণ্ড ছিল, তার চেয়ে মুসলমানি বিচারব্যবস্থা অনেক উন্নতমানের ছিল। শাহেনশা জাহাঙ্গীর নিজে অসংযমী হলেও তাঁর রাজত্বে সুরাপানাদি নিষিদ্ধ ছিল। জাহাঙ্গীর নিজের শয়নকক্ষে একটি স্বর্ণঘণ্টার সঙ্গে নগরের দুর্গদ্বারে সেই ঘণ্টার সঙ্গে একটি শিকল আটকে রাখতেন। এই শিকল স্পর্শ করলেই বিচারপ্রার্থী প্রজারা বিনা ব্যয়েই বিচার পেতেন। সম্রাট বাংলার শাসনকার্য নির্বাহের জন্য সুবাদারের অধীনে দশজন ফৌজদার নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরাই বিচারের ব্যবস্থা দেখভাল করতেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ মোগলের বিচারপদ্ধতির পরিবর্তন করেন। তিনি নিজামত, দেওয়ানি, ফৌজদারি ও কাজির আদালত পরস্পর বিভক্ত করেছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে একজন অতিরিক্ত ফৌজদার নিযুক্ত ছিল মুর্শিদাবাদে।

ইংরেজরা পুরাতন বিচারপদ্ধতি বদলে ফেলে নিজেদের স্বার্থে বিচারপদ্ধতি চালু করেছিলেন।

বর্গির হাঙ্গামায় ইংরেজদের খুব অসুবিধা হলেও কলকাতার কিন্তু বেশ কিছু উন্নতি হয়েছিল। আত্মরক্ষার জন্য ইংরেজ কোম্পানি কলকাতার চারদিকে প্রশস্ত খাত খনন করিয়েছিলেন। মারাঠারা কিন্তু কলকাতা আক্রমণ করেনি। বর্গিরা কলকাতা আক্রমণ না করায় বাংলার ভদ্রলোকরা কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলেন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলায় পুঁথির ভার লইয়া
গোঁসাই মোহান্ত যত চোপলায় চড়িয়া।
ক্ষেত্রি রাজপুত্র যত তলোয়ারের ধ্বনি
তলোয়ার ফেলাইয়া তারা পলায় অমনি।
কায়স্থ বৈদ্য যত যে যে গ্রাম ছিল।
বরগির নাম শুনি সেসব পলাইল।
সোনার বেনে পলায় ধনরত্ন লইয়া
বোঁচকা-বুঁচকি করি বাহুকে করিয়া।
ঘেরাও হইতে নবাব আইল কাটুয়াতে
শুনিয়া ভাস্কর তবে লাগিল ভাবিতে।
তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল
যত গ্রামের লোকসব যে যথা পলাইল।

আলিবর্দী খাঁ যদি বর্গির আক্রমণে বিব্রত না হতেন—তাহলে বোধহয় ইংরেজরা কলকাতায় আটঘাট বেঁধে বসতে পারতেন না।

কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট সৃষ্টির অনেক আগে ১৭৫৫ সালের ৩১ জানুয়ারি কলকাতার গভর্নর-কর্তৃক মনোনীত ২৪ জন অধিবাসী ও ফৌজদারি মোকদ্দমার জন্য 'কোর্ট' অব রিকোয়েস্ট' ও শোষণ-আদালতে বিচার করতেন। স্বয়ং গভর্নর ও তাঁর সদস্যরা প্রয়োজনে তার উপর চূড়ান্ত বিচার করতেন।

নন্দকুমারের কথায় ফিরে আসা যাক। মীরজাফরের রাজ্য-প্রাপ্তির জন্য নন্দকুমার সবরকম চক্রান্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চক্রান্ত প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল। ক্লাইভই ছিলেন মীরজাফর-বিধাতা, তিনিও নন্দকুমারের কিছু অনভিপ্রেত কাজের জন্য তাঁর উপর ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মনিবেগম ক্লাইভকে দিয়ে নন্দকুমারকে নিজামতের পদে বসাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানির খুব কাছের হওয়া সত্ত্বেও মণিবেগমের অনুরোধ ক্লাইভ প্রত্যাখান করেছিলেন। রেজা খাঁ নিজমতির সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। নন্দকুমারের অভিযোগেই এক সময় বিলেতের কর্তৃপক্ষ রেজা খাঁকে পদচ্যুত করেছিলেন। কিন্তু নন্দকুমার শেষরক্ষা করতে পারেননি। উপরন্তু তাঁকেই ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হয়েছিল।

ক্লাইভ, ভেরিলস্ট প্রমুখ গভর্নরগণ মুর্শিদাবাদ গেলে—মণিবেগমের আতিথ্য স্বীকার করলে প্রতিদিন তাঁদের দু'হাজার টাকা করে দিতে হত। এই আতিথ্য গ্রহণের অর্থের কাহিনী প্রকাশ পেয়েছিল হেস্টিংসের বিচারের সময়। এজন্য অবশ্য নন্দকুমারের কৃতিত্ব বেশি। তিনি বিলাতের কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন—তা ছিল।

"Every Governor coming to Murshidabad received two thousond rupees a day in lieu of provisions, beyond. That Munny Begum had not given a single cowril and every payment would appear on the record. At the ..trial.. of Warren Hastings the managers of the impeachment having summoned the auditor of the Indian office, he read from a book of public accounts a statement of the allowance made of Murshidabad to Lord Clive first and next to Varelost when they were Governors which confirmed the truth of the Begum's. declaration that every Governor at Murshidabad received the same allowance as Hastings."

নন্দকুমারকে হয়তো ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হত না—যদি না তিনি কোম্পানির কর্মচারী বা গভর্নর সাহেবদের বে-আইনি অর্থোপার্জনে মাথা না ঘামাতেন। তিনি যখন মীরজাফরের ডানহাত স্বরূপ মুর্শিদাবাদে কাজকর্ম

করতেন, তখন ওয়ারেন হেস্টিংস সেখানে রেসিডেন্ট ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে সেই সময় সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল।

১৭৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের তদন্ত রিপোর্ট—যা পাঠানো হয়েছিল তার থেকে জানা গিয়েছিল কোম্পানির প্রধান প্রধান কর্মচারীরা নবাবকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসানোর জন্য এবং রেজা খাঁকে কর্মকর্তা করার জন্য এই দু'জনের কাছ থেকে ১৭ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন। এদেশে কোম্পানির প্রধানরা রেজা খাঁর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার আগে দুর্লভরাম ও নবকুমারের কাছ থেকেও কয়েক লক্ষ টাকা উপঢৌকন হিসাবে নিয়েছিলেন। যারা বেশি টাকা উপহার দিতেন—তাঁরাই কোম্পানির প্রধান প্রধান কর্মচারীর আনুকূল্য পেতেন।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দৌলতে এবং বিলাতে ইংরেজ কর্তাদের কৃপায় যাঁরা গভর্নর হয়ে এদেশে প্রশাসন চালিয়েছিলেন—তাঁরা স্বদেশে নবাব বলে আদরিত হতেন।

চার

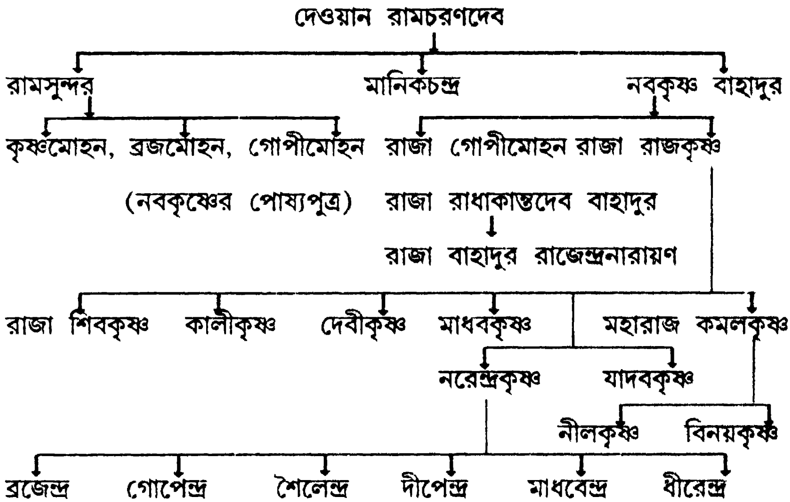
রাজা নবকৃষ্ণ একসময় মহারাজা নন্দকুমারের কাছে কাজ করতেন। নন্দকুমার ছিলেন তদানীন্তন কলকাতার উচ্চ-ব্রাহ্মণশ্রেণীর জাঁদরেল মানুষ। অন্যদিকে নবকৃষ্ণ ছিলেন হীন-কায়স্থ। ভেরিলস্টের সময় চার্লস হুগয়ারের কাছে নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এসেছিল, তা নিয়ে কলকাতা শহরে তোলপাড় শুরু হয়েছিল।

নবকৃষ্ণের উৎকোচ গ্রহণ ও গৃহস্থের পরিবারবর্গের সতীত্বনাশ অতি নিন্দনীয় ব্যাপার হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। ইংরেজদের প্রিয়পাত্র হওয়ার সমস্ত অভিযোগ থেকেই রেহাই পেয়েছিলেন নবকৃষ্ণ। আর নন্দকুমার হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজের চক্ষুশূল। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা-মামলায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস, রেজা খাঁ ও নবকৃষ্ণ। সাক্ষীরা ছিলেন হেস্টিংস ও তাঁর পারিষদবর্গের হাতের লোক।

ভেরিলস্ট সেকালের ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের প্রতিবাদ করতেন বলে—তাঁকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। নিজ স্বার্থে নবকৃষ্ণ ইংরেজদের দালাল বনে যাওয়ায় কলকাতার ন্যায়পরায়ণ লোকেরা নবকৃষ্ণের উপাধি ও অর্থ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ঘৃণা করতেন। নানা কারসাজিতে নবকৃষ্ণ'দেব' উপাধি আদায় করে নিয়েছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ ক্লাইভ ও হেস্টিংসের আমলে তদানীন্তন কলকাতার একজন বিশেষ ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন সে কারণে নবকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

কলকাতার শোভাবাজারে ছিল নবকৃষ্ণের বাস। পরের পাতায় তাঁদের বংশলতিকা দেওয়া হল।

শোভাবাজার রাজবংশ



১৭৬৪ সালে ক্লাইভ দ্বিতীয়বার গভর্নর হয়ে কলকাতায় কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলেন নবকৃষ্ণ দেশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। তিনিই ইংরেজ ও নবাব উভয়েরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। তিনি অনেক সময় মুর্শিদাবাদের গুপ্ত খবর ইংরেজদের কাছে পৌঁছে দিতেন।

মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধের সময় মহাবাজ নবকৃষ্ণ মেজর অ্যাডমসের বেনিয়ান পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় মেজরের সঙ্গে নবকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। মেজর আহত হয়েছিলেন ভীষণভাবে। মেজরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনা হয়েছিল। এসময় নন্দকুমার দিল্লির সম্রাটের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন এই সন্দেহে জেনারেল কর্নাক নন্দকুমারকে বন্দি করে কলকাতায় পাঠানোর সংকল্প নিলেন, কিন্তু নবকৃষ্ণের অনুরোধে ইংরেজ গভর্নর নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আর কোনও পদক্ষেপ নিলেন না।

ইংরেজদের মোসাহেব নবকৃষ্ণের সর্বদা ভয় ছিল চতুর নন্দকুমারকে চোখের আড়ালে পাঠিয়ে দিলে তিনি যে কোনও অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারেন। নিজের স্বার্থেই নবকৃষ্ণ নন্দকুমারের উপর ইংরেজ। সাহেবদের অনুকম্পা আদায় করেছিলেন। বুদ্ধি ও চাতুর্যে দু'মহারাজাই অনেক খেলা খেলেছেন। ক্লাইভের অনুকম্পায় নবকৃষ্ণ 'মহারাজা' উপাধি পেয়েছিলেন। ক্লাইভের সঙ্গে কাশী গিয়েছিলেন রাজা বলবন্ত সিংহের সঙ্গে জমিদারি বন্দোবস্ত করতে পাটনার সিতাব

রায়ের সঙ্গে গোলযোগের মীমাংসাও মহারাজা নবকৃষ্ণের চেষ্টাতেই হয়েছিল। এই সময় তিনি কাশীতে বিশ্বেশ্বরের নাটমন্দিরে 'নবকৃষ্ণের' নামে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিছুদিন পর কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। তিনি মহারাজা উপাধি ছাড়াও দিল্লির বাদশার কাছ থেকে ছয়-হাজারি মনসবদারি পেয়েছিলেন।

ক্লাইভ তাঁর উপর আরজবেগী দপ্তর (আবেদনপত্রাদি গ্রহণ বিভাগ) মালখানা, ২৪ পরগনার মাল আদালত ও তহশীলদপ্তর এসব দপ্তর তিনি শোভাবাজারের বাড়ি থেকেই পরিচালনা করতেন।

কিছুদিন পর নবকৃষ্ণের মাতৃবিয়োগ হয়। মাতৃশ্রাদ্ধে মহারাজ নবকৃষ্ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। তখনকার বাংলার সব রাজা, মহারাজা, জমিদার, তালুকদাররা তাঁর শ্রাদ্ধ সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নবসাজে সজ্জিত হয়েছিল শোভাবাজার এলাকাটি। এর থেকেই বোধহয় এলাকার নাম হয়েছিল 'সভাবাজার' বা শোভাবাজার।

ভেরিলস্টেরও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন নবকৃষ্ণ। তিনি নন্দকুমারের সামাজিক প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন।

নন্দকুমারের হাত থেকে ক্রমেই এক-একটি ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল। সর্বাপেক্ষা অপমানের ব্যাপার ছিল তাঁর কাছ থেকে জাতিমালা কাছারির ভার নিয়ে তা নবকৃষ্ণকে প্রদান করেন। নবকৃষ্ণ সাতটি বিয়ে করলেও কোনও পুত্রসন্তান না হওয়ায় নিজের দাদারই তৃতীয় পুত্র গোপীমোহন দেবকে পোষ্য হিসেবে নেন। পরে তাঁর ১৭৮২ সালে চতুর্থ পত্নী এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। ১৭৯৭ সালের ২২ নভেম্বর নবকৃষ্ণের মৃত্যু হয়।

সুপ্রিম কোর্ট ছাড়াও সে সময় একটি অ্যাপিলেট কোর্ট ছিল। বর্তমান ঘোড়দৌড় মাঠের পিছনে ভবানীপুর অঞ্চলে যে প্রাসাদোপম বাড়িতে আজ মিলিটারি হাসপাতাল, সেখানেই ছিল আপিল আদালতটি। এখানেই দেওয়ান ও ফৌজদারি মামলার শুনানি হত। এই আদালতের বিচারসীমানা ছিল সমগ্র বাংলার জন্য। সাধারণের কাছে তা পরিচিত ছিল 'সদর দেওয়ানি আদালত' নামে।

হেস্টিংসের অনুকম্পায় ও স্বার্থে কান্তমুদি হয়েছিলেন 'কান্তবাবু'। কান্তবাবু যদি বিতর্কিত দলিল নিয়ে সত্যি কথা বলতেন, তবে জাল করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হতেন না। কান্তমুদিকে কাউন্সিলের কাছে আসতেই দেওয়া হয়নি অভিযোগ দায়ের কবার সময়। হেস্টিংস দীর্ঘদিন গভর্নর থাকার পর ১৭৮৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি নন্দকুমারের ফাঁসির দশ বছর বাদে পদত্যাগ করেন।

নবকৃষ্ণের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। ১৭৩২ সালে মুড়াগাছায় তিনি

জন্মগ্রহণ করেন। কারও ধারণা তাঁর জন্ম হয়েছিল গোবিন্দপুরে, শৈশবে তাঁর মায়ের প্রচেষ্টায় তিনি আরবি, ফার্সি, উর্দু ও ইংরাজি ভাষা শিখেছিলেন। ধনকুবের লক্ষ্মীকান্ত ধরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নবকৃষ্ণ ইংরেজ মহলে পরিচিত হয়েছিলেন। হেস্টিংস সেই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একজন কেরানি মাত্র। তিনি নবকৃষ্ণকে তাঁর ফার্সি শিক্ষক নিয়োগ করেন।

হেস্টিংস ও নবকৃষ্ণ সমবয়সি ছিলেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। হেস্টিংসকে যখন কাশিম বাজারের কুঠিতে পাঠানো হয়েছিল তখন, নবকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। কাশিমবাজারে বসবাসকালে নবকৃষ্ণ হেস্টিংসের দূত হিসাবে কাউন্সিলে যাতায়াত করতেন, নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করার জন্য যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, নবকৃষ্ণ সবই জানতেন। এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে এবার যখন কলকাতা আক্রমণ করতে এসে কাশিমবাজারের কুঠি লুঠ করে হেস্টিংসদের বন্দি করেন, তখন নবকৃষ্ণ হেস্টিংসকে কান্তমুদির সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছিলেন এবং নিজে কলকাতায় এসে ইংরেজদের সব খোঁজ খবর দেন। ফলে ইংরেজরা সতর্ক হওয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই নবাব কলকাতায় পৌঁছে যান। ছাউনি ফেলেন চিৎপুরে। এর কিছু দিন আগে মুর্শিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে অপর একটি ষড়যন্ত্র হয়েছিল। রাজা রাজবল্লভ এসময় কলকাতায় ইংরেজদের কাছে এক দূত পাঠান। দূত কলকাতায় এসে তদানীন্তন গভর্নর ড্রেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাব দিলেন—যেন রাজার প্রেরিত পত্রখানা একজন বিশ্বস্ত হিন্দুকে দিয়ে পড়ানো হয় এবং তাকে দিয়েই যেন উত্তর লেখানো হয়। ড্রেক নবকৃষ্ণকে দিয়ে গোপনে পত্রটি পড়িয়ে তাঁকে, দিয়েই উত্তর লিখিয়েছিলেন।

ড্রেক ও নবকৃষ্ণের কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিশ্বস্ত ভেবে মুন্সী করেন তাজউদ্দিনকে বরখাস্ত করে। তাঁর বেতন নির্ধারিত হয়েছিল ৬০ টাকা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ড্রেক, হলওয়েল, ক্লাইভ ও হেস্টিংস প্রত্যেকেই নবকৃষ্ণের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। ক্লেভারিং ও মনসনের মৃত্যুতে হেস্টিংস যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। বাংলার রাজস্ব ও বিচারবিভাগ সম্বন্ধে সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে তিনি কলকাতা সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিলেন। তাঁর দুটি কীর্তির কথা ভোলা যাবে না। প্রথমটি সেন্ট জন বা পাথুরিয়া গির্জা এবং দ্বিতীয়টি এশিয়াটিক সোসাইটি।

সেন্ট জন গির্জা যে জমিতে অবস্থিত সেই জমিটি ছিল নবকৃষ্ণের। হেস্টিংসের অনুরোধে নবকৃষ্ণ জমিটি দান করেছিলেন। আজও তাঁর স্বহস্তে লেখা জমির

দানপত্র গির্জার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত আছে। অন্যদিকে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস হয়তো উদ্ধার করাই যেত না।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারি স্বত্ব পেয়েছিল। এবং তা প্রজা বিলি করেছিল। হার ছিল প্রতি বিঘা—তিন টাকা। শহর কলকাতায় একসময় ছিল ধানের মাঠ, ধান চাষ হত এবং ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মোত্তর ছিল বর্তমান কলকাতার সব অবস্থা বিশ্বাস করাও কঠিন। হয়তো জমিদারি স্বত্ব না পেলে ভারতবর্ষের শাসন ইংরেজদের হাতেও যেত না।

ইদানীংকালে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি নিয়ে এত মাতামাতি না হলে নন্দকুমারের ফাঁসির কথা এ প্রজন্মের মানুষজন প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ধনঞ্জয়ের ফাঁসি আরও একবার ভীষণরকম নাড়িয়ে দিয়ে গেল আমাদের স্মৃতির প্রেক্ষাপটকে।

আমরা ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন বসু, সূর্য সেন, দীনেশ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ রায়, ভবানী ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ মুখার্জির ফাঁসির কথাই যখন ভুলে গিয়েছি; তখন নন্দকুমারের ফাঁসির ইতিহাস না জানাটাই স্বাভাবিক। নন্দকুমারের ফাঁসির ইতিহাস যখন বর্ণিত হলই—তখন প্রসঙ্গক্রমে কয়েক জন বীর বিপ্লবীর ফাঁসির ইতিহাস ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা যেতে পারে। তার আগে একটি কাহিনী তুলে ধরা গেল।

পাঁচ

১৭৭৪ সাল থেকে ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত হাইড ছিলেন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের পিউনিজজ।

তদানীন্তন কালে চৈতন শীল ছিলেন কলকাতার একজন ধনী ব্যক্তি। সেময় চোরডাকাতের উপদ্রব ছিল। কয়েকজন সাহেব-ডাকাত ও এদেশের কয়েকজন ডাকাত মিলে চৈতন শীলের বাড়িতে ডাকাতি করে। চৈতন শীলের অভিযোগে ডাকাতির একটি মামলা রুজু হয়। কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল (যেরূপ দেওয়া আছে হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা সে কালের ও একালের' বইটিতে)।

কলিকাতা সুপ্রিম কোর্ট

(মিস্টার জাস্টিন হাইডের এজলাস)

ফরিয়াদি	আসামিগণ
অনারেবল কোম্পানি বাহাদুব ও চৈতন শীল	মি. রুশো, মি. বুফাস মি. জারান, মি. র‍্যাঙ্ক, মি. কোয়েল, মি. ফ্যার্সি নেভ ও মোহন পাল।

চৈতন শীলের জবানবন্দী—আমি একজন হিন্দু ব্যবসায়ী। চিনাবাজারে আমার একখানি দোকান আছে। গত ২৮ মাঘ রাত্রে আমার বাড়িতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। তখন রাত্রি দুইটা। এই সময় হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙিয়া যায়। বাড়ির মধ্যে অনেকগুলি লোকের গলার আওয়াজ শুনিতে পাইয়া বিছানা হইতে উঠিয়া পড়ি। দেখিলাম—বাড়ির সদর দরজা খোলা। তখন আমি খুব উচ্চৈঃস্বরে আমার চাকরদের ডাকিতে লাগিলাম। একজন চাকর আমার ডাক শুনিয়া উঠানের দিকে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি তাহার চিৎকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। তারপর আর কোনও সাড়া শব্দ নাই। অনুমানে বুঝিলাম, ডাকাতেরা তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে কথাটি কহিবার বা চেঁচাইবার কোনও উপায় রাখে নাই। এই সময়

আমি বুঝিতে পারি ডাকাতেরা আমার অন্দরমহলেও প্রবেশ করিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চিৎকার করিতেছে। বাহিরের মহলে আমার একটি গুদাম ঘর ছিল। ডাকাতেরা একটি শাবল দিয়া সেই ঘরের হুড়কা খুলিয়া গুদামের মধ্যে প্রবেশ করিল, তারপর দেখিলাম ডাকাতেরা আমার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াছে। আমি প্রাণভয়ে মশারির আড়ালে লুকাইলাম। ডাকাতেরাও সেই গৃহে কাহারও সাড়াশব্দ না পাইয়া একটি কাঠের সিন্দুক ভাঙিয়া সোনা রুপার জিনিসগুলি লইয়া চলিয়া গেল। একখানি চৌকির উপর কতকগুলি নূতন কাপড় ও পরিচ্ছদাদি ছিল। প্রস্থান সময়ে ডাকাতেরা তাহাও লইতে ভুলে নাই।

ডাকাতদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া আমার মনে হইল, তাহারা সকলেই সাহেব। তবে তাহাদের সঙ্গে আর একজন লোক ছিল, তাহার বেশভূষা দেখিয়া বাঙালি বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। আমার ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক চারি হাজার টাকা।

(কতকগুলি বামাল এই সময়ে সাক্ষীকে দেখানো হয়। সাক্ষী সেগুলি শনাক্ত করিয়া বলে এ সবই আমার জিনিস)।

চৈতন শীলের চাকরের জবানবন্দী—গত ১৮ মাঘ রাত্রি আন্দাজ দু'টোর সময় আমার মনিবের বাড়িতে ডাকাত পড়ে ওই সময় আমি গোয়াল ঘরসংলগ্ন একটি চালা ঘরে ঘুমাইতেছিলাম। রাত্রি দু'টোর সময় বাড়ির উঠানে অপরিচিত লোকজনের কথা শুনিতে পাইয়া আমি বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসি। দেখিলাম উঠানে ১৩-১৪ জন সাহেব দাঁড়াইয়া। তাহাদের দুই-তিনজনের হাতে একটি করিয়া জ্বলন্ত মোমবাতি। সাহেবরা আমাকে দেখিতে পাইয়া তখনই আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিল। মুহূর্তের মধ্যে দড়ি দিয়া আমার হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল। আর একজন আমার বুকের ওপর বসিল। আমি ভয়ে চিৎকার করিতে পারিলাম না। তারপর আমি সিন্দুক ও দরজা ভাঙ্গিবার শব্দ শুনিতে পাইলাম। কাজ শেষ হইলে তাহারা বাড়ি হইতে চলিয়া গেল। তাহাদের সহিত একজন বাঙালি আছে বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

গোরা সার্জেন্ট ও গলবি সাহেবের জবানবন্দি—গত ৬ মার্চ আমি মি. স্মিথের (জাস্টিস অব) নিকট হইতে একটি ওয়ারেন্ট পাই। এই ওয়ারেন্টে বর্তমান আসামিগণের অন্যতম রুশো সাহেবকে ধরিবার আদেশ ছিল। এই আদেশপত্র পাইয়াই আমি ফিটজেরাল্ড নামক এক কনস্টেবলকে লইয়া রুশোর বাটী খানাতল্লাশির ফলে আমরা একটা আঁধারে লণ্ঠন ; কতকগুলি কাপড়ের থান, একখানি তরবারি ও একটি লালরঙের জ্যাকেট পাই। এই জ্যাকেটটি যাহাতে

তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যায়, তজ্জন্য আসামি রুশো আমাদের বিস্তর অনুরোধ করেন। সেই জ্যাকেটটি পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখি জামার আস্তিনের মধ্যে এক গুপ্ত স্থানে একটি গুলি ভরা পিস্তল লুকানো আছে। তাহার পর আমি রুশো ও অন্যান্য আসামিদের ধরিয়া ফেলি। অপহৃত মালপত্র আদালতে দাখিল করিয়াছি।

জারানের জবানবন্দী—এই ব্যক্তি একজন আসামি। কিন্তু কোম্পানির পক্ষে হইয়া সাক্ষী করিয়া লওয়া হয়। জারান বলিল, আমি হ্যানোভার লোক। ১৫ বৎসর এই ভারতবর্ষে বাস করিতেছি। ৫ বৎসর আমি মাদ্রাজে একজন ইংরেজের চাকুরি করিয়াছিলাম। তৎপরে আমি কলকাতায় আসি। কলকাতাতেও আমি পাঁচ বছর কাটাইয়াছি। টাইলার ও লেডলি সাহেবের বাটীতে চাকরি করিয়াছি। আমি আসামিদের সকলকে চিনি। আমরা সকলে মিলে চৈতন্য শীলের বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়েছিলাম। গত ২৭ জানুয়ারি। আমার কাছে এসে বলে তুমি রুশোর বাড়ি চলো—একটা ডাকাতি করিতে হইবে।' আমি তাহার সঙ্গে রুশোর বাড়ি যাই। সেখানে আরও নয়জন সাহেব-ডাকাত উপস্থিত ছিল। রাত্রি দশটার পর মোহন পাল (আসামি) আমাদের নিকট আসিয়া সংবাদ দিল—আজ আর ডাকাতির কোনও রূপ সুবিধা হইবে না। কারণ এখনও তাহার বাড়িতে অনেক লোকজন জাগিয়া বসিয়া আছে। সেদিন আর ডাকাতি করা হইল না। ২৯ তারিখে আবার আমরা রুশোর বাড়িতে জমায়েত হই। মোহন পাল রাত্রি ১২টার সময়ে এসে বলল "দল সব জমায়েত হইয়াছে তো?" আজই বেশ সুযোগ। তারপর সে রাত্রি একটার সময় ফিরিয়া সকলকে নিয়ে চৈতনের বাড়ি উপস্থিত হইল।

তখন আমাদের মধ্যে বচসা আরম্ভ হইল। বিষয় সদরদ্বারে চৌকি দিবে কে? শেষে ঠিক হইল আমি, কোয়েল ও আর একটি লোক। বাকিরা ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতর হইতে চিৎকারের শব্দ পাইলাম। তাহারা বেশি দেরি করিতেছে দেখিয়া আমি বলিলাম, তোমরা শীঘ্র কাজ সারিয়া লও, বড় দেরি হইতেছে।

তাহার পর সমস্ত দল বাটীর বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের হাতের মোমবাতি নিভাইল। মোহন পাল ছাড়া সকলেই রুশোর বাড়িতে গেলাম।

সাক্ষী জেরান জেরার মুখে স্বীকার করিয়া ছিল—"তাহারা প্রত্যেকে ছাব্বিশ টাকা করিয়া ভাগে পাইয়াছে। আমাদের দলে ইউরোপিয়ান পর্তুগিজ ইটালিয়ান ও অন্য লোকও ছিল। সকলকে জড়ো করিলে দুইশত হয়। এইসব লোক জড়ো করিয়া একদিন 'হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক' লুঠ করিব মনে ভাবিয়াছিলাম।"

চিফ জাস্টিস হাইড সাক্ষ্য সাবুদ হয়ে যাওয়ার পরে জুরিদের চার্জ দিলেন।

তাঁরা একবাক্যে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করেছিল।

১৭৯৫ সালের ৬ আগস্ট একসংবাদে প্রকাশ পূর্বোক্ত ডাকাতির আসামিদের জেলখানায় এনে রাখা হয়েছে। ছয়জনের বিরুদ্ধে ডাকাতি করায় প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি হাইড। দণ্ডিত আসামিরা যেখানে ডাকাতি করেছিল সেখানেই প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হবে। ইংরেজ ডাকাতদেরও ফাঁসি হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পক্ষপাত দেখায়নি।

ছয়

'ধনঞ্জয়ের ফাঁসি' এবং তা নিয়ে প্রচার মাধ্যমের বাড়াবাড়ি কিছুটা হলেও কিন্তু নন্দকুমারের ফিরে আসার একটা সুযোগ করে দিল। নবাবি আমলে কোম্পানির শাসনে নন্দকুমারের ফাঁসি, ভারতে বীরবিপ্লবী ক্ষুদিরাম ; সত্যেন্দ্রনাথ, সূর্য সেন, রামকৃষ্ণ রায়, বামকৃষ্ণ বিশ্বাস, মদনলাল ধিংরা, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, গোপীমোহন সাহা, অনন্তহরি মিত্র, প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী, রাজেন লাহিড়ি, যতীন দাস, দীনেশ গুপ্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার, কালীপদ মুখার্জি, কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী, দীনেশ মজুমদার, বৈকুণ্ঠ শুক্ল, মনিন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, অসিত ভট্টাচার্য, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, নির্মল জীবন ঘোষ, ভবানী ভট্টাচার্য, সত্যেন বর্ধন, চিত্তরঞ্জন মুখার্জি, সুনীলকুমার মুখার্জি, মানসকুমার বসু ঠাকুর, দুর্গাদাস রায়চৌধুরী, নন্দকুমার দে, ফণিভূষণ মুখার্জি, নীরেন্দ্রসাহা মুখার্জি, কালীপদ আইচ, হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী চাকচরণ বসু, কালাচাঁদ সাহা প্রভৃতির ফাঁসি নিয়ে কতটুকু আলোচনা হয়েছে।

সে অর্থে ধনঞ্জয় ভাগ্যবান পুরুষ। তবে কিছুটা হলেও ধনঞ্জয়ের ফাঁসি পর্বটা উক্ত ব্যক্তিদের স্মরণপটে এনে দিয়েছে।

সশস্ত্র বিপ্লবীদলের নেতা নরেন গোস্বামী দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা মেনে নিতে পারেন নি বলে হুগলির কানাইলাল দত্ত ও মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিচারাধীন বন্দি অবস্থায় আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে জেলের মধ্যেই গুলি করে হত্যা করেছিলেন নরেন গোঁসাইকে। ১৯০৮ সালের ২১ নভেম্বর ওল্ড আলিপুরের জেলে (বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেল) সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়েছিল মজঃফরপুর জেলে ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট। ১৯৩৯ সালে আলিপুর দায়রা আদালতে চলছিল 'আলিপুর বোমা মামলা' মামলায় সরকারপক্ষের কৌশলী শ্রীআশু বিশ্বাসকে আদালত চত্বরের মধ্যে গুলি করে মেরেছিলেন খুলনার বিপ্লবী চারুচরণ বসু। সেই অপরাধে তাঁর ১৯০৯ সালের ১৯শে মার্চ ওল্ড আলিপুর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

ঢাকার উমাচরণ দত্তগুপ্তের পুত্র বীরেন্দ্রনাথ একজন সশস্ত্র বিপ্লবী, দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আদালতের আঙিনায় ডেপুটি

সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ শ্যামসুল আলমকে গুলি করে মেরেছিলেন। আলম ছিলেন আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার মুখ্য তদন্তকারী অফিসার। ১৯১০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বীরেন্দ্রনাথের ফাঁসি হয়েছিল।

বিখ্যাত বালেশ্বর যুদ্ধের দুই তরুণ বিপ্লবী ফরিদপুরের নীরেন দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের আত্মরক্ষার কারণে রাজমহান্তিকে হত্যা করেছিলেন। ১৯১৫ সালে ৯ সেপ্টেম্বর বিখ্যাত বালেশ্বর যুদ্ধে নীরেন দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন বাঘা যতীনের নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এঁরা ধরা পড়েছিলেন। ওড়িশ্যার বালেশ্বর জেলে ১৯২৫ সালের ২২ নভেম্বর তাঁদের ফাঁসি হয়।

হুগলির গোপীমোহন সাহা কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে গুলি করে মারতে গিয়ে ভুলক্রমে হত্যা করেন মি. আর্নস্টডেইকে। এই হত্যাপরাধে তাঁকে ১৯২৪ সালের ১ মার্চ ওল্ড আলিপুরে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বিপ্লবী অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী জেলা গোয়েন্দা আধিকারিক ভূপেন চ্যাটার্জিকে জেলের অভ্যন্তরে হত্যা করার অপরাধে তাঁদের দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯২৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

উত্তরপ্রদেশের কাঁকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বঙ্গসন্তান রাজন লাহিড়ির ফাঁসি হয়েছিল ১৯২৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর গোন্ডা জেলে।

এবার আসা যাক দীনেশ গুপ্তের কথায়, রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানকারী দীনেশ গুপ্তের নাম অবশ্য অনেকেই জানেন। মহাকরণ অভিযান হয়েছিল ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর। দীনেশের সঙ্গে অভিযানে ছিলেন বাদল গুপ্ত ও বিনয় বোস। বাংলার কারা মহা পরিদর্শক কর্নেল সিম্পসন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। বাদল গুপ্ত ও বিনয় বোস বিচারের আগেই মারা যাওয়ায় আদালতে বিচার হয়েছিল শুধু দীনেশের। তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

সশস্ত্র বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিলেন চট্টগ্রামের ছেলে। মাস্টারদার দলে যুক্ত থাকাবস্থায় কুমিল্লার আরক্ষা পরিদর্শক তারিণী মুখার্জিকে ভুলবশত মহা আরক্ষা পরিদর্শক ক্রেগ-সাহেব মনে করে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। ১৯৩১ সালের ৪ আগস্ট।

বিপ্লবী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়েছিল ১৯৩২ সালের ২২ আগস্ট বরিশাল জেলে। তিনি দলের জন্য চরমুগুরিয়া ডাকঘরে ডাকাতি করেছিলেন।

তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ছিলেন বরিশালের ছেলে। আর সন্তোষ মিত্র ছিলেন কলকাতার। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সূত্রে এই দুই বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল হিজলি বন্দি শিবিরে, এই বন্দি শিবিরে ওয়াটার যমুনা সিং ও অন্যান্য

কর্মচারীদের গুলিতে ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় এই দুই বীর বিপ্লবীর। বন্দিদের এই হিজলি বন্দি শিবিরে যেভাবে অমানবিক মৃত্যু ঘটল তার জন্য কোনও ব্যবস্থা পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়—সে সময় কোনও মানবাধিকার কমিশন ছিল না। নাই বা থাকল। দেশের মানুষ কতটুকু সোচ্চার হয়েছিলেন। মানবাধিকার কমিশন না থাকলেও মানবকল্যাণমুখী মানুষ তো ছিল।

ধনঞ্জয়ের ফাঁসি একটা উপলক্ষ্য, তা যদি না হবে তাহলে সেদিন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল মানুষের মানবিকতাবোধ—যেদিন নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল। স্বার্থ অন্য জায়গায়—বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না।

যতদূর জানা যায়—মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসি হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি। মহানায়ককে চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। সংবাদপত্রে প্রকাশ ফাঁসুড়ে নাটা মল্লিকের পূর্বপুরুষ নাকি সূর্যসেনের ফাঁসির দড়িতে টান মেরেছিল। সংবাদ লেখার আগে জেলের নথি দেখলেই তো সত্যটা প্রমাণ হয়। অবশ্য, সেই নথি যদি এখনও সযত্নে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। তাছাড়া সাংবাদিকের যদি প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকে সত্য সংবাদ পরিবেশন করার তবেই তো মানুষ সত্য ইতিহাস জানতে পারবেন।

তারকেশ্বর দস্তিদারেরও ফাঁসি হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলে। তখন তো টেলিভিশন ছিল না। কিন্তু একাধিক সংবাদপত্র ছিল।

কিন্তু এইসব ঐতিহাসিক ফাঁসি নিয়ে কতটুকু আলোচনা হয়েছে?

হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও কৃষ্ণচৌধুরী দু'জনেই ছিলেন চট্টগ্রামের ছেলে। এখানে পল্টন ময়দানে ইউরোপীয়দেব হত্যা চেষ্টাপরাধে ১৯৩৪ সালের ৫ জুন মেদিনীপুরের সেন্ট্রাল জেলে তাদের ফাঁসি হয়।

মহারাজা নন্দকুমার বিচারে প্রহসনের শিকার হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ কুলধিপতি দেশের থেকে নিজের স্বার্থ বেশি দেখিয়েছিলেন। তবুও তিনি নবাবদেরই সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ ভারতবর্ষের মসনদে বসুক—এটা তিনি চাননি। তিনি প্রথম ইংরেজ গভর্নরদের কাছে প্রথমে মীরজাফর এবং তার মৃত্যুর পর মীরকাসিমকে চেয়েছিলেন বাংলার মসনদে।

ধনঞ্জয়ের ফাঁসিকে বোধহয় কোনও অবস্থাতেই বিচারের প্রহসন বলা যাবে না। তবু ধনঞ্জয়ের মতো একজন অপরাধী হয়তো ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়ে গেল, আগামি দিনই বলতে পারবে এর সত্যাসত্য। প্রহসনের বিচারে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি না হলে—তিনিও ইতিহাসের পাতায় স্থান পেতেন কিনা সন্দেহ।

আবার ফিরে আসা যাক মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকদের ফাঁসির কাহিনীতে।

বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করার প্রয়াস

নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি মেদিনীপুর জেল থেকে একবার পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু কলকাতায় পুনরায় ধরা পড়েছিলেন। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। ১৯৩৪ সালের ৯ জুন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। সেই মামলার মূল নথিটি চোখে পড়েছিল আলিপুর জজ কোর্টের বিচার সংগ্রহশালায়। মূল নথিটি পড়ার সৌভাগ্য হয়নি।

বিপ্লবী অসিত ভট্টাচার্যের বাড়ি ছিল কুমিল্লা জেলায়। তিনি দলের জন্য ডাকাতি করেছিলেন। ইটখোলা ডাকাতি মামলায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। তাঁর ফাঁসি হয় ১৯৩৪ সালের ২ জুলাই সিলেট জেলে।

১৯৩৪ সালটি যেন বিপ্লবীদের কাছে ফাঁসির বছরের মিছিল ছিল। ভারতে ফাঁসির ইতিহাস লিখতে গেলে ১৯৩৪ সাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯৩৪ সালটিকে কেন্দ্র করে কেবলমাত্র বিপ্লবীদের ফাঁসি নিয়ে লেখা যায় একটি বড় বই। কে লিখবে সেই বই কেইবা পড়বে? বরং ধনঞ্জয়দের মতো অপরাধীদের ফাঁসি নিয়ে লিখলে অনেকেই পড়বেন।

দেশের জন্য আত্মবলিদান করে যাঁরা ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন—তাঁদের উদ্দেশ করে বলা যেতেই পারে—"তোমাদের আত্মা যেন না কাঁদে—আমাদের অবক্ষয়ের জন্য। তোমাদের আত্মা যেন একটি বক্র হাসি হাসে।"

মেদিনীপুরের জেলাশাসক বার্জকে হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী ও নির্মলজীবন ঘোষ। রামকৃষ্ণ ও ব্রজকিশোরের ফাঁসি হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ২৫ অক্টোবর। নির্মলজীবনের ফাঁসি হয়েছিল তার পরের দিনই।

ঢাকার মতিলাল মল্লিকের ফাঁসি হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর ঢাকা জেলে।

বড়লাট অ্যান্ডারসনকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করায় বিপ্লবী ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী জেলে। রবীন্দ্রনাথ ব্যান্যার্জির ফাঁসি হয় ১৯৩৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর।

ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের বিপ্লবী রোহিনি বড়ুয়া ইংরেজদের চামচা পুলিশ সাব-ইনস্পেকটর এরশাদ আলির শিরচ্ছেদ করায় তার ফাঁসি হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর।

বিপ্লবী ছাড়াও তো কত মানুষের ফাঁসি হয়েছে—তাদের অপরাধ প্রমাণ হওয়ায়। ইতিপূর্বে ফাঁসি নিয়ে ধনঞ্জয়ের ফাঁসির আগে বা পরে সম্ভবত এত শোরগোল শোনা যায়নি।

সংবাদপত্রে রোজই দেখতাম ধনঞ্জয় কনডেমড সেলে। নিজের ছোট রেডিও

সেটে গান শুনত। কখনও রবীন্দ্রসংগীত, কখনও হিন্দি। কখনও বা সংবাদ। শেষ পর্যায়ে সে নাকি ফাঁসির আদেশ মকুব হয়ে গিয়েছে—এই সংবাদের জন্য উন্মুখ হয়েছিল। পরে সে রেডিও সেটটা ছুঁড়ে ভেঙেই ফেলল। একদিন সংবাদ পত্রের একাংশে দেখলাম—সে একাই নাকি অপরাধ করেনি, তার সঙ্গে আরও লোক ছিল। কই তাদের নাম তো ফাঁসির দড়ি গলায় দেওয়ার আগে বলে গেল না। পরোক্ষভাবে প্রমাণ তো হয়েই গেল ধনঞ্জয় পাশবিক অত্যাচার ও হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিল। অন্য কেউ যদি তার সঙ্গে থেকেও থাকে, তা হলে তো ধনঞ্জয় নিজে যে অপরাধী সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

'ফাঁসি' বহাল থাকা না থাকার বিতর্ক। আইন প্রণেতা বা আইনরক্ষকরা যদি মনে করেন—অপরাধ যত পাশবিক, মর্মান্তিক হোক না কেন, অপরাধীকে প্রাণদণ্ড না দেওয়া হয়। তাহলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে। অপরাধের প্রকৃত বিচার-বিবেচনা করে "রেয়ার অব দি রেয়ারেস্ট" কেসে যদি অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় তাহলেও কি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে? যারা অপরাধের শিকার হল—যে ধরনের অপরাধ-চিন্তা করলেও কষ্ট হয়, তাদের বা তাদের পরিবারের বা সমাজের সেই স্তরের মানুষের মানবাধিকার কি বিবেচিত হবে না?

মানবাধিকার একজন বিচারাধীন বন্দির নিশ্চয়ই আছে। এমনকি দণ্ডিত আসামিরও আছে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয়, স্বাধীন ভারতে প্রাণদণ্ডের মতো দণ্ড তুলে দেওয়া হল। তাতেই কী মানবাধিকারের মূল সুর রক্ষিত হবে? পণ্ডিতদের জন্য এই বিতর্ক এখন থাকুক।

ধনঞ্জয়ের ফাঁসির আগের কয়েকদিনের সংবাদ থেকে তার কনডেমড সেলের ব্যবহার ও কথাবার্তা থেকে জানা গিয়েছে তার থেকে অন্তত বুঝতে অসুবিধা নেই যে—ফাঁসির মঞ্চে নির্ভয়ে উঠতে সে চায়নি। চাইবেই বা কেন—তার অপরাধ কোনও আদর্শগত ছিল না, ছিল না রংমশাল—যা থেকে পরের প্রজন্ম শিক্ষণীয় কিছু পাবে।

আদর্শের জন্য যাঁরা মরতে ভয় পাননি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁরা নির্ভয়ে উঠে নিজেরাই গলায় ফাঁসির দড়ি পরে নিয়েছিলেন হাসতে হাসতে।

ধনঞ্জয়ের কাছে সেদিক থেকে আমরা নিশ্চয়ই ঋণী। ওদের ফাঁসির দিনের ইতিহাস আমাদের আর একবার মনে করিয়ে দিলেন। এই প্রজন্মের যারা জানতেন না, তাঁরাও নতুন করে জেনে নেওয়ার সুযোগ পেলেন। অবশ্য কুলিবাজারে ফাঁসির মঞ্চে উঠার সময় নন্দকুমারের মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছিল তা অবশ্য ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সাত

ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলালে কিন্তু দেখা যাবে—নন্দকুমার কোম্পানির গভর্নর হেস্টিংস ও কাউন্সিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস, ক্লভারিং ও মনসনের থেকে নিজের স্বার্থে কিছু সুযোগ-সুবিধা নিলেও তিনি কিন্তু গুপ্তভাবে সব সময় নজর রেখেছিলেন নবাবরাই যেন বাংলার মসনদে বসতে পারেন। মীরজাফরকে নানা কায়দায় তিনি নবাবের মদনদে বসাতে সাহায্য করেই ছিলেন, মীরজাফরের পরে তাঁর পুত্র মীরকাশিমকেও নবাবি দেওয়ার জন্য গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। ইংরেজরা বিশেষ করে হেস্টিংস এই সব খবর জানতে পেরে নন্দকুমারকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন। নন্দকুমার ছিলেন কলকাতার ব্রাহ্মণদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। সাধারণ মানুষের বিপদে-আপদে তিনি পাশে দাঁড়াতেন। নন্দকুমার কিন্তু নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের উপকার করার জন্য ব্রতী হননি। প্রচুর পরিমাণ গুরুদক্ষিণা দিয়ে রাজবল্লভ, নন্দকুমার, রামচরণ, সুখময় প্রভৃতিরা সকলেই মহারাজা উপাধি লাভ করেছিলেন। কোম্পানি সেই সব উপাধির সনদ দিল্লি থেকে আনিয়ে দিয়েছিল। মহারাজা উপাধি পাওয়ার পর এই সব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা শোভাযাত্রা করে এই উপাধি পাওয়ার কথা জাহির করতেন। সাধারণ মানুষ এই সব উপাধি পাওয়া রাজা-মহারাজাদের কোম্পানির পোষ্যপুত্র বলে মনে করতেন। এদের মধ্যে মহারাজা নন্দকুমার কিন্তু এই দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাদের অন্যায় কাজের বর্ণনা দিয়ে বিলেতের কর্তাদের খবর পাঠাতেন নিজের অর্থ ব্যয় করে।

মণিবেগমের স্বার্থ দেখায় কোম্পানির মাতৃস্বরূপা মণিবেগম চেয়েছিলেন—নন্দকুমারকে যেন দেওয়ান পদে বসানো হয়। কিন্তু ক্লাইভ মনিবেগমের অনুরোধ না শুনে রেজা খাঁকে সেই পদে বসিয়ে দিয়েছিলেন নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। সেই থেকে নন্দকুমার বদলা নেওয়ার জন্য লক্ষ্য রাখছিলেন সব পরিস্থিতি। নন্দকুমার ভালো করেই জানতেন নিজের স্বার্থে হেস্টিংস রেজা খাঁর পক্ষেই থাকবেন।

এই দেশের ক্ষমতাবান মানুষেরা বিদেশিদের সঙ্গে হাত না মেলালে দেশের

সর্বনাশ হত না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে রেজা খাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল সেই খবর বিলেত পর্যন্ত পৌঁছেছিল। বিলেতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাজা নন্দকুমার এজেন্ট পাঠিয়ে সেই এজেন্টের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন রেজা খাঁর দ্বারাই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছে। কলকাতার বিচারবিভ্রাট সেই সময় ভালোভাবেই বোঝা গিয়েছিল। নন্দকুমারের অভিযোগে প্রকৃতপক্ষে রেজা খাঁকে বিচারাধীন হতে হয়েছিল। আবার সেই নন্দকুমারই বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজের সহায়তায় দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা লাভ করেছিলেন। বাংলার ইংরেজ মুসলমান দরবারের সঙ্গে নন্দকুমারের যেরকম ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, সেই সময় অন্য কোনো বাঙালির সেরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কেবল নবকৃষ্ণ প্রমুখের দাসত্বে ও কৌশলে নন্দকুমার শেষপর্যন্ত সকলের মন জুগিয়ে চলতে পারেননি।

নন্দকুমার ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান। তাঁর ধমনীতে ছিল আর্য রক্তস্রোত প্রবহমান। তাঁর মস্তিষ্কে বুদ্ধি থাকলেও কালোপযোগী শিক্ষাদীক্ষা ছিল না। সেই সময় সকলেই উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীদের অনুগ্রহপ্রাপ্তির জন্য অর্থদান, তোষামোদ ও হীন কাজ করতে দোষের মনে করত না। কিন্তু নন্দকুমার ইংরেজ কর্মচারীদের উপেক্ষা করে তাদের বিরুদ্ধে বিলেতে অভিযোগ করলে তাদের মনোভাব কীরকম হতে পারে তার অনুমান করতে কষ্ট হওয়ার কারণ নেই। যখন প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ইংরেজ কর্মচারীদের ঢাকার মসলিন, দলমাদল দিয়ে তোযামদ করে যাচ্ছিলেন, সেই সময় নন্দকুমার বুঝেছিলেন দেশের পরাধীনতা ক্রমশই এগিয়ে আসছে, নন্দকুমার সেই মনোভাব মোটামুটি বোঝাতে পেরেছিলেন বিলেতের কর্তাদের। নন্দকুমারের আদর্শে বিলেতের মহাপুরুষরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। অনেক দোষ থাকলেও মহারাজা নন্দকুমারের মনোভাব নিশ্চয়ই গৌরবের। নিজের স্বার্থ না থাকলে সাধারণত খুব কম লোকই কাজ করে কিন্তু তদানীন্তন সময়ে যখন নবাব ও ইংরেজদের কাছ থেকে পাওয়ার খেলায় লিপ্ত রাজা-মহারাজারা, তখন কিন্তু সাহসে ভর দিয়ে মহারাজা নন্দকুমার মুর্শিদাবাদের দরবারের সর্বাপেক্ষা অর্থশালী বলবান মুসলমান কর্তা রেজা খাঁর সঙ্গে শত্রুতা বা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগে করতে পারতেন? বিচার প্রার্থনা করতে পারতেন? নন্দকুমার ভালোভাবেই জানতেন ইংরেজের হাতের লোক রেজা খাঁর বিরুদ্ধে বিচার চাওয়ার পরিণাম কোন্ পর্যায়ে যেতে পারে।

নন্দকুমার নিজেও কি জানতেন না—রেজা খাঁর বিরুদ্ধে বিচার হলেও তা প্রহসনে পরিণত হবে। ইংরেজ মহাপুরুষদের কৃপায় রেজা খাঁর টিকিটিও কেউ ছুঁতে পারবে না। সব বুঝতে পেরেও নন্দকুমার চোখের সামনে অবিচার-অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অসীম সাহসে নিজের অর্থ ব্যয় করে অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে

প্রতিবিধান করার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। নন্দকুমার বাংলার শত সহস্র লোকের মৃত্যুতে তাদের প্রেততর্পন করার জন্য রেজা খাঁর বলিদানোৎসর্গ আবশ্যক মনে করেছিলেন। বিলেতে কিন্তু তোলপাড় হয়েছিল নন্দকুমারের অভিযোগ নিয়ে। নন্দকুমার বিলেতের কর্তাদের কাছে প্রশংসিতও হয়েছিলেন অনেক কিছু সত্য জানতে পেরে।

হেস্টিংস নানা দোষে দোষী থাকলেও তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন—তাঁরও উচিত ছিল সব দিকে নজর দেওয়া। তাহলে এত অত্যাচার-অবিচার হয়তো হত না। নিজের দোষ বুঝতে পারলে কি হবে স্বার্থ অতি বিষম ব্যাপার।

কলকাতায় খুব আড়ম্বরের সঙ্গে রেঁজা খাঁর বিচার শুরু হল। প্রহসনের বিচার আর কতদূর এগুবে। বিচারে রেজা খাঁর কিছুই হল না।

তখন নন্দকুমারের অধীনস্থ কর্মচারীরা যথাসম্ভব সম্মান, অর্থ সমস্তই লাভ করেছিলেন কিন্তু নন্দকুমার থাকায় তাঁদের আরও পাওয়ার অভিলাষা চরিতার্থ হচ্ছিল না। নন্দকুমারের কর্মচারীরাও নিজেদের স্বার্থে ইংরেজের পদলেহন করতে শুরু করেছিলেন। ডেকে এনেছিলেন দেশের সর্বনাশ। যে সময় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল তখনই বাংলার মুসলমান রাজত্ব শেষ হয়ে ইংরেজ রাজত্ব বাংলায় যুগ পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল। তখন থেকে প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির এই দেশে শাসন ও বিচারের হাতেখড়ি।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বোধহয় ইংরেজ কোম্পানির কাছে আশীর্বাদস্বরূপ ছিল।

ক্লাইভেরই ইংল্যান্ডে বিচার হয়েছিল। তা থেকে বোঝা যায় তিনিও বিলেতে ফিরে শান্তিতে ছিলেন না। ক্লাইভ বিলেতের বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েও সুস্থির হতে পারেননি। তিনি রোগে, দুঃখে ও অপমানে স্বদেশ ত্যাগ করে স্বাস্থ্যলাভের জন্য নানা স্থলে ভ্রমণ করছিলেন। কিন্তু এই ভ্রমণ সত্ত্বেও তিনি শান্তিলাভ করেননি। রাতে তাঁর ঘুম হত না, থেকে থেকে ফিট হতেন। শেষপর্যন্ত জীবনের শেষ জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করার পর তিনি ইহলীলা শেষ করেছিলেন স্বহস্তে ১৭৭৪, ২২ নভেম্বর। অমর বীর লর্ড ক্লাইভের জীবনচরিত লেখক বলেছিলেন, "with all of faults Clive was of the men who did the most for greatness of England."

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে কলকাতায় ছিয়াত্তর হাজার লোকের মৃত্যু হয়। সমগ্র বাংলায় এক কোটি লোক মারা গিয়েছিল। রেজা খাঁকে বাংলার লোক ছিয়াত্তরের মন্বত্তরের জন্য দোষী মনে করতেন।

রেজা খাঁ বিলিতি প্রণালীতে রাউল ধান একচেটিয়া ব্যবসায় দুর্মূল্য করে অর্থোপার্জন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে ঘিরে বাংলায় তখন একটা ছড়া খুব প্রচলিত ছিল বিশেষভাবে রেজা খাঁকে উদ্দেশ্য করে। ছড়াটি ছিল—

"নদনদী খাল-বিল সব শুকাইল, অন্নাভাবে লোক সব যমালয়ে গেল।
দেশের সমস্ত কিনিয়া বাজারে, দেশ ছারখার হল, রেজা খাঁর তরে।
একচেটে ব্যবসায় দাম খরতর, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হল ভয়ংকর।
পতি-পত্নী পুত্র ছাড়ি, পেটের লাগিয়ে, মরে লোক,
অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে।"

এই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পিছনে যার বিশেষ হাত ছিল তিনি শক্তিধর ইংরেজ তোষামোদকারী রেজা খাঁ। নন্দকুমার ছাড়া এই রেঁজা খাঁর বিরুদ্ধে কোম্পানির কাছে বা নবাবমহলে কেউ অভিযোগ করেননি। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার বাসনা তো ছিলই, তবুও মহারাজা নন্দকুমার সাধারণ মানুষের কান্না সহ্য করতে না পেরে নিজের আখের নষ্ট করে প্রতিবাদ ও অভিযোগ জানিয়েছিলেন যথাস্থানে। এই জন্যেও নন্দকুমার ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন, কেবলমাত্র তাঁকে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেওয়ার জন্য নয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মহারাজা নন্দকুমার ছিলেন কলকাতায় ব্রাহ্মণ কুলপতি। ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। নবকৃষ্ণ মহারাজা খেতাব পেয়েও কায়স্থ সন্তান হওয়ায় হিন্দু সমাজের কাছ থেকে কোনও শ্রদ্ধাভক্তি পাননি। স্বভাবতই তিনি হীনম্মন্যতায় ভুগছিলেন।

নবকৃষ্ণ দের প্রচেষ্টায় ও ইংরেজের অনুকম্পায় ব্রাহ্মণের প্রভাব সম্পূর্ণ শেষ করার জন্য কলকাতায় জাতের বিচার করার জন্য কাছারি তৈরি করা হয়। এই জাতের কাছারির বিচারক পদে নিযুক্ত কবা হয়েছিল ইংরেজের প্রিয়পাত্র রাজা নবকৃষ্ণ ও কান্তমুদিকে (দাস)। এই জাতের কাছারির বিচারে কায়স্থ ও তিলি হিন্দু সমাজের শিরোমণি হয়েছিলেন। ব্রাহ্মরা বৃত্তিভোগী হয়ে মর্যাদা হারিয়েছিলেন। আর্য হিন্দু সমাজের সমাধি কোম্পানির রাজত্বের প্রারম্ভেই হয়েছিল। এই কাজের জন্যও হেস্টিংস চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সেকালের লোকেরা রাধাচরণ, রেজা খাঁ, নবকৃষ্ণের অব্যাহতি ও নন্দকুমারের ফাঁসি বিচারবিভ্রাট ও কলকাতার কলঙ্ক বলে মনে করতেন।

হেস্টিংস সাহেব ছিলেন প্রথমে কোম্পানির গভর্নর। তখন নন্দকুমারের সঙ্গে ছিল হেস্টিংসের ভীষণ বন্ধুত্ব। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস কলকাতার গভর্নর হতেই নন্দকুমারের সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দিল।

মহারাজা নন্দকুমার তাঁর বিচার-কৌতুকের আগেই উৎকোচাদির উল্লেখ করেছিলেন। এইবার ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ যে সুদীর্ঘ লিখিত আবেদন করেন তাতেই তিনি নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। হেস্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমারের বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ ঘটল।

এই সময় বর্ধমানের মহারাজ তিলক চাঁদের বিধবা স্ত্রীও হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অত্যাচারের কথা জানান কলকাতার কাউন্সিলে। হেস্টিংস মনে করলেন—নন্দকুমারের প্ররোচনাতেই মহারাজা তিলক চাঁদের বিধবা স্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে সাহসী হয়েছেন। সেই কথা ভেবে নন্দকুমারের আবেদন সভায় পড়ার পরেই হেস্টিংস কাউন্সিলের প্রধান সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তিনি নন্দকুমারের পেশ করা অভিযোগের বিষয়বস্তু আগে থাকতেই জানতেন কিনা! ফ্রান্সিস সাহেব এই ধরনের প্রশ্ন শুনে খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

হেস্টিংস সম্ভবত মনে করেছিলেন নন্দকুমার তাঁর অভিযোগ নিয়ে আর বিশেষ এগুবেন না। হল অন্যরকম। ১৩ মার্চ নন্দকুমার আবার একটি আবেদনপত্র পেশ করে কাউন্সিলকে জানালেন তিনি পূর্বে পেশ করা আবেদনপত্র তো তুলছেনই না, বরং সাক্ষ্য দিয়ে তিনি তাঁর পেশ করা অভিযোগ প্রমাণ করতে প্রস্তুত। এইবার সত্যি সত্যি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল।

পূর্বেও অল্পবিস্তর উল্লেখ করা হয়েছে। তবুও গুরুত্ব বিবেচনা কারে তুলে ধরা হচ্ছে বিষয়টি।

নন্দকুমারের অভিযোগপত্রে বিশেষভাবে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। প্রথমত, পুণ্যশ্লোকা রানি ভবানী বাহারবন্দ পরগনা কীসের জন্য বলপূর্বক গ্রহণ করে কান্তমুদির সন্তান লোকনাথের হল?

দ্বিতীয়ত, বাদশাহের প্রদত্ত রাজসম্মান ঝালরওলা পাল্কী যেটি নন্দকুমারের জন্য পাঠানো হয়েছিল সেটি কেন হেস্টিংস সাহেব নিজে ব্যবহার করেন?

তৃতীয়ত, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মণিবেগমের বংশলোপ হলে নিজামতির সিংহাসনে ঝুর, সন্তানকে বসানোর সময় মণিবেগমের কর্তৃত্ব বজায় থাকল কেন?

চতুর্থত, রাজা গুরুদাসের নিয়োগ ব্যাপারে কোম্পানির কর্মচারী কান্তমুদির ভাই নৃসিংহ প্রভৃতির মারফত উপহারলাভের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা সত্য কিনা?

এই সব প্রশ্ন শুনে কাউন্সিলে সভাগৃহে রঙ্গমঞ্চের অভিনয় শুরু হয়েছিল তার বিবরণও পাওয়া যায় নানা পুস্তক-পুস্তিকায়। কাউন্সিলের সভায় মনসন সাহেব নন্দকুমারকে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হেস্টিংস ও বারওয়েল প্রতিবাদ করে বললেন—নন্দকুমার সভায় উপস্থিত হন তাঁরা তা মানতে

পারছেন না। এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। একদিকে ফ্রান্সিস, মনসন ও ক্লেভারিং, অন্য দিকে স্বয়ং হেস্টিংস ও বারওয়েল। হেস্টিংস সভায় অভিমত প্রকাশ করে বললেন, নন্দকুমারই সব কিছু করাচ্ছেন তাই সভায় তাঁর উপস্থিতি কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর বিরুদ্ধে যিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাঁকে সভায় ডাকা যাবে না। এই বলে সভাস্থল থেকে হেস্টিংস সাহেব বেড়িয়ে গেলেন। বেড়িয়ে যাওয়ার আগে সেই সভাভঙ্গ করার আদেশ দিয়ে গেলেন। হেস্টিংসের পিছু পিছু বারওয়েল সাহেবও সভা থেকে বেড়িয়ে গেলেন।

নন্দকুমার কিন্তু প্রস্তুতই ছিলেন। তিনি মনসন সাহেবের আদেশ মোতাবেক সভায় প্রবেশ করে দুটি মূল দলিল দাখিল করেন। ওই দলিল প্রমাণ করার জন্য কান্তমুদিকে প্রয়োজন হওয়ায় সভা কান্তমুদিকে তলব করেন। কান্তমুদি এলেন না। তিনি লিখিতভাবে সভাকে জানালেন স্বয়ং গভর্নর সাহেবের নিষেধ থাকায় তাঁর পক্ষে সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। কান্তমুদির লিখিত বক্তব্যর পরিপ্রেক্ষিতে সেদিনের সভা বন্ধ হয়ে গেল। নন্দকুমার ও কান্ত প্রহসনপর্ব শুরু হল।

এর পরই কান্তমুদি হেস্টিংসের কৃপায় কান্তবাবু বলে পরিচিত হতে লাগলেন। এর পর কান্তবাবুর বলে পরিচিত হতে লাগলেন। এরপর কান্তবাবুর নামকরণ হল কৃষ্ণকান্ত দাস। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিবাদে কৃষ্ণকান্ত দাসের নাম থেকে নাকি কৃষ্ণ বাদ গিয়েছিল। কান্তমুদির ব্যাপারে সব পরিকল্পনাই ছিল হেস্টিংস সাহেবের।

কান্তমুদিকে সভার আদেশ অমান্য করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অবমাননার অভিযোগ আনা হলে তাঁকে পরে সভায় উপস্থিত হয়ে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। তাঁর আর জবাবদিহি করতে ভয় কী। হেস্টিংস স্বয়ং তাঁর পরিচালক। সেইদিন সেখানে হেস্টিংস কান্তবাবুকে কলকাতার সর্বপ্রধান অধিবাসী বলে অভিনন্দন দিলেন। ঘোষণা করলেন কান্তবাবুকে সভার আদেশ অমান্য করার জন্য যদি কোনও শাস্তি দেওয়া হয়, তা হলে তিনি জীবন দিয়ে তাঁর কান্তমনিকে বাঁচাবেন।

সবাই সব বুঝতে পেরেছিলেন। তৈরি হয়েছিল সেই ছড়া।

"কান্তবাবু হয়ে কাবু, হাবুডুবু খায়
তড়ুং লাগান হোক ক্লেভারিং-এর রায়
হেস্টিংস যাহার হাত, তারে করে কাবু,
বাংলার হেন লোক, আছে কেহে বাবু।"

এই ছড়াটির পিছনেও হেস্টিংসের হাত ছিল, তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে ফল ভালো হবে না। ভবিষ্যতে যেন নন্দকুমারের মতো কেউ তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার না হন।

এই কান্তমুদিই জাত কাছারির বিচারক হয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহে 'নন্দী' উপাধি লাভ করেছিলেন।

ইংরেজের বিচারের যতই প্রশংসা করা হোক না কেন, কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বিচারবিভ্রাট ছিল। কলকাতায় গোপীনাথ মদনমোহনের মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিল প্রহসনের বিচারে। প্রহসনের বিচার হয়েছিল নবকৃষ্ণ, রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ প্রমাণ করার মতো সাক্ষ্য-সাবুদ ছিল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কিন্তু এই দেশের ইংরেজ প্রভুদের স্বার্থে সেই সাক্ষ্য-সাবুদ হাজির করতে পরা যায়নি। তাই নিষ্কৃতি পেয়ে যায় অভিযুক্তরা।

অন্যদিকে মিথ্যে অভিযোগ প্রমাণ করে মহারাজা নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হল। হেস্টিংস্ বিলেতের বিচারেও রেহাই পেয়ে গেলেন।

এই সব বিচার প্রহসন দেখে কি বলা যায় না—

"বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

অথচ ইংরেজের আইনে যে উৎকোচ প্রদান করে এবং যে তা গ্রহণ করে—উভয়ই সেই ক্ষেত্রে দোষী! আইন থাকলে হবে কী? আইন তো কার্যকরী করতে হবে।

প্রহসনের বিচারে অবশ্যই মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি মানা যায় না। কিন্তু নন্দকুমারের কৃতকার্য আলোচনা করলে তাঁকেও কি নিষ্কলঙ্ক বলে আখ্যায়িত করা যাবে?

নন্দকুমারই সিরাজউদ্দৌলার সর্বনাশ করে খাল কেটে বাংলায় কুমির এনেছিলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য মীরকাশিমেরও ভূমিকাকেও কম দায়ী করা চলে না। কলকাতার ষড়যন্ত্রে উমিচাঁদ ও মহারাজা নন্দকুমারকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বাদশ সহস্র মুদ্রায় কিনেছিল।

নন্দকুমারের কলা কৌশলে ফরাসিরা সিরাজদ্দৌলার সহায়তা না পাওয়ায় পরাস্ত হয়েছিল।

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে এরই কিছুদিন পর সেই একই দোষে দোষী নন্দকুমারই হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের জন্য অভিযোগ এনে বিচার প্রার্থনা করেছিলেন। প্রহসনের বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসিকে অনেকে মনে করেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

ভারী একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল এই কলকাতায়। হেস্টিংস একসময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানি ছিলেন। তখনও গভর্নর হননি। একদিন ভান্সিটার্টের সভায় কথা কাটাকাটি হচ্ছিল বার্টসন সাহেবের সঙ্গে হেস্টিংসের। বার্টসন সাহেব

হেস্টিংসকে মিথ্যাবাদী বলে গালে চড় মেরেছিলেন। এইভাবে সভায় চড় মারায় বার্টসন সাহেবকে সভ্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরে অবশ্য ক্ষমাভিক্ষা করায় বার্টসনকে সভ্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই সব ঘটনা ঘটেছিল রিচার্ড কোটের বাড়িতে। এই বাড়িটি ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে বার্টসন সাহেব মারা যাওয়ায় কোম্পানি কিনে নিয়ে গভর্নরের সভাস্থল করা হয়েছিল। কলকাতায় ওয়ারেন হেস্টিংস বার্টসনের চড় খেয়ে আক্কেলসেলামি লাভ করেছিলেন গভর্নরের পদে বসার আগেই।

হেস্টিংসের ষড়যন্ত্রে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হলেও তাঁর মধ্যে অনেক গুণও ছিল। তিনি যোলো বছর বাংলায় নানা পদে ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শেষ গভর্নর। কলকাতায় সামান্য কেরানিগিরি করে গভর্নর ও পরে গভর্নর জেনারেলের পদ হেস্টিংসের ভাগ্যেই জুটেছিল।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করে কলকাতা দখল করে নিয়ে কলকাতাকে আলিনগর করেছিলেন, সে সময় হেস্টিংস কাশিমবাজারে বন্দি হয়েছিলেন। পরে মুক্ত হয়ে ফলতায় এসে উঠেছিলেন। ক্লাইভ যখন মাদ্রাজ থেকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে কলকাতা আবার দখল করে নিয়েছিলেন হেস্টিংস ক্লাইভকে খুবই সাহায্য করেছিলেন। ক্লাইভ খুশি হয়েছিলেন হেস্টিংসের পারদর্শিতায়। ক্লাইভের প্রচেষ্টায় মীরজাফরের দরবারে হেস্টিংস ইংরেজ কোম্পানির রেসিডেন্টের পদ পেয়েছিলেন। কোম্পানির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ সভার সভ্য হন। তিনি ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে হন কলকাতার গভর্নর। এর কয়েক বছর পরেই হন বাংলার গভর্নর জেনারেল। কোম্পানির বাণিজ্য-ব্যবসা থেকে হেস্টিংসের দৌলতেই পত্তন হল এই দেশে দেওয়ানি রাজপট। কলকাতাই হয়েছিল এই রাজপটের কেন্দ্রস্থল। হেস্টিংস সাহেব মুসলমানি শাসন ও বিচারের প্রণালী পুরোপুরি পরিবর্তন করে কলকাতায় প্রথম ইংরেজি শাসন ও বিচারের সূত্রপাত করেছিলেন।

১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট পর্যন্ত হেস্টিংসের সূত্রপাত করা বিচার-পদ্ধতি চলছিল। গভর্নর জেনারেল হওয়ার পর অবশ্য বিচার-পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছিল।

কলকাতায় প্রথম কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হল। এই সুপ্রিম কোর্ট থেকেই ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

আট

কিছু আগেই শুরু করেছিলাম ধনঞ্জয়ের ফাঁসি ও তার মহড়া নিয়ে। একালের সংবাদ মাধ্যম হঠাৎ ধনঞ্জয় চট্টপাধ্যায়েব ফাঁসি ও ফাঁসুরে নাটা মল্লিককে এত তুলে না ধরলে বোধহয় ফাঁস-ফাঁস খেলায় মত্ত হত না ফুলের মতো একাধিক শিশু। একজন পাশবিক অত্যাচারী ও হত্যাকারীকে নিয়ে এত হই-চইয়ের প্রয়োজন ছিল কি? সবাই বোধহয় স্বীকার করবেন—ধনঞ্জয় কোনও আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করেনি। আদর্শ ছিল না বলেই ফাঁসির আদেশ সর্বত্র বহাল থাকায় এত কান্নাকাটি করেছিল।

যারা আদর্শের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সংগ্রাম করতে গিয়ে ফাঁসির দড়িতে গলা দিয়েছিলেন, ফাঁসির দড়িতে গলা দেওয়ার আগে তাঁদের মনোভাবের কথা কি আমরা ভুলে গেলাম? যদি ভুলেও যাই ধনঞ্জয়ের ফাঁসির আলোড়নে তাঁরা অনেকেই যেন উঠে এলেন।

তারকেশ্বর দস্তিদার ছিলেন সতীশচন্দ্র দস্তিদারের ভাই। ফাঁসির আগে তিনি মা ও বউদিকে চিঠি লিখেছিলেন।

মাকে লিখেছিলেন—"মা, রাত্রে স্বপ্ন দেখি। শারদীয়া পূজার সময় শিউলি ফুলের গন্ধ যেন জানালা দিয়ে আমার কাছে আসছে।"

বউদিকে লিখেছিলেন—"বৌদি, তোমাদের স্নেহ-ভালোবাসা থেকে চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছি। মাকে বোলো, আমার যে টাইফয়েড হয়েছিল, তখনও তো মারা যেতে পারতাম। কত লোক যে প্রতিদিন নানারকমভাবে মারা যাচ্ছে। আমার এ মৃত্যু তা থেকে অনেক শ্রেয়। মনকে প্রবোধ দিও।"

কতখানি মানসিক শক্তি থাকলে ফাঁসির আদেশের কথা জানা সত্ত্বেও এই ধরনের সহজ-সরল চিঠি লেখা যায় তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

হে ধনঞ্জয়! তোমার প্রাণদণ্ড অবশ্যই খুব আনন্দের বিষয় নয়। তবে তোমার প্রচার এত বেশি না হলে ভুলতে বসেছিলাম তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির দড়ি গলায় পরবার আগে মা ও বউদিকে লেখা চিঠি দুটির কথা। দেশের প্রতি নিবেদিত

তারকেশ্বর দস্তিদারদের মতো মানুষগুলোকে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি নিয়ে হইচই না হলে হারিয়ে যেতে বসেছিল।

ধনঞ্জয়কে নিয়ে এত মাতামাতি না হলে কি তারকেশ্বর দস্তিদারের ওপরে উল্লেখিত চিঠি দুটির কথা নতুন করে মনে করা সম্ভব হত?

মাস্টারদা অর্থাৎ সূর্য সেনের ঘুমোবার চৌকির একপাশে থাকত গীতা আর অন্য পাশে রিভলভার।

তারকেশ্বর দস্তিদারের দাদা তারকেশ্বরকে জেলে পাঠিয়েছিলেন দু-খানি বই। তার মধ্যে একটি ছিল গীতা, অপরটি গীতাঞ্জলি।

তারকেশ্বরের ফাঁসির পর জেল-কর্তৃপক্ষ তাঁর পরিবারকে সেই বই দুটি পর্যন্ত ফেরত পাঠাননি।

কাঁকোরি ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামি আসফাকউল্লা ছিলেন উত্তরপ্রদেশের হিন্দুস্থান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য। কাঁকোরির ষড়যন্ত্র মামলায় আসফাকউল্লার ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। আসফাকউল্লা কোরানশরিফ হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়েছিলেন ফাঁসির মঞ্চে। আসফাকউল্লার ফাঁসি হয়েছিল ১৯২৭ সালে।

প্রীতিলতার লেখা পাওয়া গিয়েছিল তাঁর যুদ্ধের পোশাকের পকেট থেকে।

নির্মল সেন চলে যাওয়ার পর প্রীতিলতা লিখে রেখেছিলেন—

"কণ্টক-মুকুট শিরে পরেছিলে বলে
আজ কত কোহিনূর তব পদতলে।"

মাস্টারদা ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগে যে বিদায়বাণী দিয়েছিলেন তা ছিল হৃদয়-বিদারক। তিনি বলেছিলে, —"আমার শেষ বাণী, আদর্শ ও একতা। ফাঁসির দড়ি আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার মাথায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে। এই তো সাধনার সময়। বন্ধুরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার এই তো সময়। ফেলে আসা দিনগুলোকে স্মরণ করার এই তো সময়।"

এরপরই মাস্টারদা বলেছিলেন, "কত মধুর তোমাদের সকলের স্মৃতি। তোমরা; আমার ভাই বোনেরা তোমাদের মধুর স্মৃতি বৈচিত্র্যহীন আমার এই জীবনের একঘেয়েমিকে ভেঙ্গে দেয়। উৎসাহ দেয় আমাকে। এই সুন্দর পরমমুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য দিয়ে গেলাম স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। আমার জীবনের এই শুভ মুহূর্তে এই স্বপ্ন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জীবনভর উৎসাহ ভরে ও অক্লান্তভাবে পাগলের মতো সেই স্বপ্নের পিছনে আমি ছুটেছি। জানি না কোথায় আজ আমাকে থেমে যেতে হচ্ছে। লক্ষ্যে পৌছানোর আগে মৃত্যুর হিমশীতল

হাত আমার মতো তোমাদের স্পর্শ করলে তোমরাও তোমাদের অনুগামীদের হাতে এই ভার তুলে দেবে, আজ যেমন আমি তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। আমার বন্ধুরা এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—কখনও পিছিয়ে যেও না। পরাধীনতার অন্ধকার দূরে সরে যাচ্ছে। এই দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার নবারুণ কখনও হতাশ হয়ো না। সাফল্য আমাদের আসবেই। ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন।"

ফাঁসির মঞ্চে আসামির মুখে ফাঁসির ঠিক আগে এই বাণীর কথা কি ভাবা যায়!

হয়তো বলা যাবে—এই সব মহানায়ক বিপ্লবীরা আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন তাই মৃত্যুভয় ওদের ছিল না।

ধনঞ্জয়ের কাছে কোনও আদর্শ ছিল না। অপরাধ করার পর প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনে তার ছিল মৃত্যুভয়। আদর্শ থাকলে কি মৃত্যু ভয় থাকে? বোধহয় থাকে না।

ধনঞ্জয়ের ফাঁসি নিয়ে প্রতিদিনের সংবাদপ্রবাহ যেন রঙ্গমঞ্চের চমকপ্রদ নাটক। তাই শুনেছিলাম ধনঞ্জয়ের ফাঁসি নিয়ে নাকি যাত্রাপালা হতে যাচ্ছিল। সরকারি নির্দেশে শেষপর্যন্ত তা হতে পারেনি।

একটি বাংলা সংবাদপত্রে ধনঞ্জয়ের ফাঁসির বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি নিয়ে কয়েক লাইন লেখা হয়েছিল। ভালো লেগেছিল সেই লেখাটুকু। অনেকদিন ধরেই মহারাজা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে প্রহসনের বিচার নিয়ে লেখার ইচ্ছা থাকলেও হয়ে ওঠেনি। ধনঞ্জয়ের ফাঁসিতে যেন নন্দকুমাররা উঠে এলেন।

মহারাজার ফাঁসি-কাহিনী লিখতে বসে অজান্তেই উঠে এলেন ফাঁসিব মঞ্চের বিপ্লবী বীররা। ধনঞ্জয় বোধহয় মনে করিয়ে দিল ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগে ও ফাঁসির মঞ্চে উঠে ওদের মানসিকতা, ওদের আদর্শ। অবশ্য তর্কের খাতিরে বলাই যায় ধনঞ্জয় সেই মানসিকতা পাবে কী করে। সে তো নিজের দৈহিক জ্বালা মেটাতে গিয়ে নৃশংস অপরাধ করেছে। তার পরিবার নাকি পূজারী ব্রাহ্মণ। ধনঞ্জয় পূজা-পার্বণে নিজেকে কতটুকু লিপ্ত রেখেছিল তা অবশ্য ভালোভাবে জানা যায়নি। কিন্তু নিশ্চয় করে বলা যায় ধনঞ্জয় মানুষের পূজারী ছিল না।

ব্যতিক্রম হলেও মহারাজা নন্দকুমারও লোভ-লালসার মানুষ ছিলেন। কোম্পানির আমলে ইংরেজ প্রশাসকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা নিয়েছিলেন, আবার মানসিক বল থাকায় বাংলার গভর্নর হেস্টিংস, কলকাতাব

দেওয়ান রেজা খাঁ, পাটনার জামিনদার সিতাব রায়, রাজা নবকৃষ্ণদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে সাহসী হয়েছিলেন। এদেরকে তুলেছিলেন কাঠগড়ায়।

মীরজাফর না থাকলে নন্দকুমার মহারাজা খেতাব পেতেন কিনা তা আজও একটা বিরাট প্রশ্ন। প্রহসনের বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি না হলে হয়তো নন্দকুমারের নাম ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যেত না।

নন্দকুমার কলকাতার সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষত ব্রাহ্মণদের জন্য কিছু ভালো কাজ করেছিলেন। সেই দিক থেকে দেখলে নবকৃষ্ণও সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে বেশ কিছু কাজ করেছিলেন।

তদানীন্তনকালে খেতাব পাওয়া রাজা-মহারাজারা যা কিছু করেছেন সবই নিজেদের স্বার্থে। কোম্পানির আমলে ইংরেজ প্রশাসকরা কি বোকা ছিলেন? এই সব রাজা-মহারাজা, নাজির, গুজির দিয়ে তো ধনদৌলত করেছিলেন।

এবার ফিরে আসা যাক দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির দিনের কথায়।

৭ জুলাই দীনেশ সকালের দিকে স্নান শেষ করে সূর্যমন্ত্র পাঠ করে নিলেন। জেলের সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ফাঁসির মঞ্চের আসামি দীনেশের মনোবল দেখে। কোনও রকম বিকার ছিল না দীনেশের মধ্যে। দীনেশের মতো বিপ্লবীরা তো জানতেনই সশস্ত্র বিপ্লব করতে গেলে জীবিত ধরা পড়লে ফাঁসির মঞ্চে ওদের উঠতে হবে। জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাতে হবে কনডেমড সেলে। দেশের জন্য মৃত্যু, সেই তো ছিল বিপ্লবীদের ব্রত। ফাঁসির মঞ্চে উঠে দড়ি গলায় দেবার আগে দীনেশের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল—"বন্দেমাতরম্-বন্দেমাতরম"।

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ হত্যা মামলায় 'ফাঁসিদণ্ডে' দণ্ডিত হয়েছিলেন ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, নির্মলজীবন ঘোষ এবং রামকৃষ্ণ রায়। ফাঁসির মঞ্চে উঠে এঁরাও সোচ্চারে বলেছিলেন "ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো" শেষ আওয়াজ ছিল—"বন্দেমাতরম্"।

মেদিনীপুরের আর এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস হত্যা মামলায় প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়েছিল। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন ধীর পদক্ষেপে। তিনিও ফাঁসির মঞ্চে উঠে বলেছিলেন—"ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো" বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্!

দেশের জন্য মৃত্যুবরণ ছিল এদের কাছে গর্বের বিষয়। আদর্শহীন ধনঞ্জয়ের পক্ষে কি 'ফাঁসিদণ্ড' মেনে নেওয়া সম্ভব?

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে হেস্টিংস নন্দকুমারকে শেষ করার জন্য প্রথম একটি মিথ্যা অভিযোগ করিয়েছিলেন কমলউদ্দিন খাঁ নামে এক ব্যক্তিকে হাত

করে। মিথ্যা মামলার অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অঙ্গীকারপত্র জালের অভিযোগ আনা হয় বোলাকিদাস জহুরির আমমোক্তার মোহনপ্রসাদকে দিয়ে। অঙ্গীকারপত্রটিতে বোলাকিদাস নিজের স্বাক্ষর ও মোহর করে সেইটি নন্দকুমারকে দিয়েছিলেন। এই অঙ্গীকারপত্র জাল ছিল না। বোলাকিদাসের মৃত্যুর পর তাঁর তত্ত্বাবধায়ক পদ্মমোহন দাস অঙ্গীকারপত্র অনুযায়ী নন্দকুমারের পাওনা টাকা শোধ করে দিয়েছিলেন। এই অঙ্গীকারপত্রে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেছিলেন মহাতাপ রায়, মহম্মদ কমল ও বোলাকির উকিল সিলাবৎ।

বোলাকির মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর এক আত্মীয় গঙ্গাবিষ্ণু বোলাকির দেনার টাকার হিসেব নিয়ে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একটি দেওয়ানি মামলা করেছিলেন। কিন্তু গঙ্গাবিষ্ণু মামলায় জিততে পারলেন না। নন্দকুমার মোহর লাগানো অঙ্গীকারপত্রটি মামলায় পেশ করে গঙ্গাবিষ্ণুর দেওয়ানি মামলাটি শেষ করে দিয়েছিলেন।

হেস্টিংস এই বৃত্তান্ত জানতে পেরেছিলেন। মোহনপ্রসাদকে দিয়ে বলানো হল বোলাকিদাসের মোহর লাগানো অঙ্গীকারপত্রটি জাল।

সাক্ষ্য মানা হল না অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করা মহাতাপ রায়কে, মহম্মদ কমলকে বা বোলাকির উকিল সিলাবৎকে।

অঙ্গীকারপত্রের মোহর যে জাল ছিল তাও প্রমাণ করা হল না আইন মোতাবেক! সব জানতেন কান্তমুদি। তাঁকে আনাই গেল না। অঙ্গীকারপত্রটি জাল ছিল বলে বোলাকির তত্ত্বাবধায়ক পদ্মমোহন দাস নন্দকুমারকে অনেক টাকা দিয়েছিলেন এই ছিল অভিযোগ। জাল করার অভিযোগে ফাঁসির বিধান ছিল তদানীন্তন ইংল্যান্ডের তৃতীয় জর্জের বিধানে। সেই বিধানানুসারেই জাল অভিযোগের বিচার হল কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে। তারপর বিচারে যা হয়েছে তা নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন।

নন্দকুমারের অভিযোগে মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের বিরুদ্ধে বিচার চলেছিল প্রায় দু-বছর! সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকতেও রেজা খাঁ ও সিতাব রায় নির্দোষ সাব্যস্ত হলেন, নির্দোষ প্রমাণ করতে হেস্টিংসই কলকাঠি নেড়েছিলেন। এই দুজনকে নির্দোষ প্রমাণ করেই হেস্টিংস ক্ষান্ত হলেন না, তিনি ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের মামলাব বিবরণী বিলেতে পাঠাবার সময় তিনি লিখেছিলেন মহারাজা নন্দকুমার একজন শঠ, প্রবঞ্চক ও অকৃতজ্ঞ। নন্দকুমারের উপর অসম্ভব চটে ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। নন্দকুমারের উপর

এত অসন্তুষ্ট হওয়ায় পূর্ব প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বাংলার আমিন পদে নিযুক্ত করা হল না।

ইতিহাসের পাতায় চোখ বোলালে পরিষ্কার নন্দকুমার যদি হেস্টিংসের তোষামোদকারী রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের বিরুদ্ধে নালিশ না জানাতেন, তাহলে বাংলার আমিন পদে হেস্টিংসের অনুকম্পায় তিনি নিযুক্ত হতেনই। বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না।

নন্দকুমার ভুল করেছিলেন হেস্টিংসের বিপক্ষ পার্টি ফিলিপ ফ্রান্সিস, মনসন ও ক্লেভারিংয়ের পক্ষ নেওয়ায়। এ কথাও সত্য ফ্রান্সিস, মনসন ও ক্লেভারিং প্ররোচিত না করলে মহারাজা নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে নিজের খরচে বিলেতের কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে এজেন্ট পাঠাতেন না। হেস্টিংস এই সব কথা জানতে পেরে মোহনপ্রসাদকে দিয়ে বোলাকিদাসের সেই অঙ্গীকারপত্র 'জাল' অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন মহারাজা নন্দকুমারকে। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে অভিযোগপত্রটি দাখিল করা হয়েছিল আর ৮ জুন জাল করার অভিযোগের মামলার শুনানি আরম্ভ হয়েছিল কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে। কত দ্রুত নন্দকুমারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছিল, বারোজনকে নিয়ে যে জুরির দলটি গঠন করা হয়েছিল তাঁরাও বুঝতে পারেননি অঙ্গীকারপত্র জাল করার অভিযোগে মহারাজা নন্দকুমারকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবেন প্রধান বিচারপতি স্যার ইলিজা ইম্পে ও অন্য তিনজন সহযোগী বিচারপতি। জুরিরা এই ধরনের দণ্ডাদেশের আদেশ শুনে পরে বেদনাহত হয়েছিলেন।

কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের আদেশে কতগুলো ফাঁসির দণ্ড হয়েছিল তা পাওয়া যায় ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের এক আদেশনামায়।

(১) ফ্রান্সিস রোজা ও তার সঙ্গীদের ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়ার পরে। কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট সব কজন ডাকাতকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

(২) মীর গোলাম আলির বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল চুরির অভিযোগ। তাকেও দেওয়া হয়েছিল ফাঁসি।

(৩) ব্রজমোহন দত্ত নামে এক অভিযুক্তের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয়েছিল চুরির। ব্রজমোহন নাকি এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে ২৫ টাকা দামের জিনিসপত্র চুরি করেছিল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট এই চুরির অপরাধে ব্রজমোহনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

(৪) ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে হরি পাল, প্রসাদ পাল, রামজয় ও চৈতন নাকি রাজপথে

রাহাজানি করেছিল। তাদেরও দেওয়া হয়েছিল রাজপথের মোড়ে ফাঁসি।

(৫) ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে জোসেফ লেপরুজ নামে এক ব্যক্তি হত্যা করে নৌকা লুঠ করেছিল। তার বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশও দেওয়া হল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল। ফাঁসির পর মৃতদেহ লোহার শিকলে বেঁধে সাধারণ রাজপথে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

(৬) বেজু মশালচির অপরাধ ছিল চুরি। তাকেও ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন।

(৭) ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে ব্যারি ও রয়েল নামে দুজন গোরা রাহাজানির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল। তাদের দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড।

মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির পরে যাদের বিরুদ্ধে কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন, তারা অধিকাংশই ছিল চোর-ডাকাত।

১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা নন্দকুমারকে অঙ্গীকারপত্র জাল করার অভিযোগে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। অথচ রডরিগ বলে এক অভিযুক্তকে আনা হয়েছিল কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তলবানাপত্র জাল করার। তাকে কিন্তু ফাঁসি দেওয়া হয়নি। তার বিরুদ্ধে আদেশ ছিল—দুই বছর ব্যাপী তুড়ুমের ব্যবস্থা ও ৩০০ প্যাগোডা জরিমানা।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপ্রসাদ শ্রীমানী নামে এক ব্যক্তিকে 'জাল' করার অপরাধে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে বিচারের জন্য আনা হয়েছিল। অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আদেশ হয়েছিল—লালবাজারে নিয়ে গিয়ে তুড়ুম প্রয়োগ। তারপর দু-বছর সশ্রম কারাবাস।

'জাল' করার অপরাধে এই ক্ষেত্রেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি।

১৮০২ খ্রিস্টাব্দে এই কলকাতা সুপ্রিম কোর্টেই 'জাল' করার অপরাধে আনা হয়েছিল অভিযুক্ত আসামি টমাস নর্মানকে। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল দু-বছর তুড়ুম দেওয়ার আর জরিমানা হয়েছিল এক টাকা।

১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে জন ম্যাকলচিন নামে এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এক মাস জেল ও এক টাকা জরিমানা।

১৮০৪ সালে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে বিচার হয়েছিল মহম্মদ টিন্ডাল নামে এক ব্যক্তির। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল নরহত্যার। অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আদেশ হয়েছিল একমাস জেল ও এক টাকা জরিমানা।

এই ঘটনাগুলি বিচার-বিবেচনা করলে বোঝা যায় তদানীন্তন কালে আইনের চোখে চুরি, জাল প্রভৃতি অপরাধ হত্যা-অপরাধ থেকে গুরুতর বলে বিবেচিত হত।

হাত পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা প্রায় সব অপরাধেই ছিল।

এক ধরনের দণ্ড-কাষ্ঠ ছিল (Pillory) তার মধ্যে অপরাধীদের মাথা গলিয়ে দিয়ে ও অপরাধীর হাত দু-খানি বেঁধে সাধারণ মানুষের সামনে অপমানিত করা হত।

তুড়ুম ব্যবস্থা অবশ্য ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৮২৮ সাল। ২৪ জানুয়ারি। এক মুসলমান ফকিরের নাম ছিল উইলিয়াম বোচ্যাম্প। সে নাকি এক সাহেবশিশুকে হাবড়া ঘাটে হত্যা করেছিল। তার বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ হল। তখন হাবড়ার যে স্থান স্কুল গ্রাউন্ড বলে পরিচিত ছিল, সেখানি ফাঁসিমঞ্চ বানানো হয়েছিল। ফকিরের ফাঁসি দেখার জন্য বহু মুসলমান জড়ো হয়েছিল। কোনও প্রতিবাদ বা দুঃখ প্রকাশ না করে শান্তভাবে ফকিরের ফাঁসি দেখে দর্শকরা যে যার বাড়ি চলে যায়।

সাহেবশিশুকে হত্যা করার জন্যেই কি ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল মুসলমান ফকিরটিকে? নতুবা নরহত্যায় ফাঁসির আদেশ বিশেষ দেখা যায়নি। পাওয়া যায় সব বিচিত্র ঘটনাবলি।

তদানীন্তন কালেও ফাঁসিমঞ্চের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট উপাস্থিত থাকতেন। তাঁর কাজ ছিল নির্দিষ্ট সময় বলা "এইবার লটকাইয়া দাও।" সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি হয়ে যেত।

হিকি সাহেব তাঁর প্রকাশিত বেঙ্গল গেজেটে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন,—ব্যারিস্টার ফ্যারোর ছিলেন নন্দকুমারের মামলায় তাঁর আইনজীবী। ব্যারিস্টার ফ্যারোর ১৭৭৮ সালে দেশে ফিরে যাওয়ার সময় তিন বছর কলকাতায় প্র্যাকটিস করে আশি হাজার পাউন্ড সঞ্চয় করেছিলেন। এই পরিমাণ অর্থের বেশিরভাগটাই তিনি আয় করেছিলেন নন্দকুমারের কাছ থেকে তাঁর মামলা পরিচালনা করার জন্যে। ব্যারিস্টার ফ্যারোর অভিমত ছিল— নন্দকুমারের মতো প্রতিপত্তিশালী হিন্দু রাজাকে জালিয়াতির মতো অপরাধের জন্য ফাঁসি দেওয়া ব্রিটিশ গর্ভরমেন্টের ইতিহাসে একটা কলঙ্কজনক অধ্যায়।

নন্দকুমার যে ফিলিপ ফ্রান্সিস, ক্লেভারিঙের বিশেষ সমর্থক ছিলেন সেই সম্বন্ধে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ফিলিপ ফ্রান্সিস চারিত্রিক দিক থেকে খুব ভালো ছিলেন না।

মজার কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করলেও বিশদভাবে আবার বলা যাক, জর্জ ফ্রান্সিস গ্রান্ড নামে কোম্পানির একজন পদস্থ কর্মচারী একটি পরম সুন্দরী ফরাসি যুবতীকে বিয়ে করেছিলেন। একদিন এক অনুষ্ঠানে সুন্দরী ফরাসি যুবতীটিকে দেখেছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ কাউন্সিল সদস্য ফ্রান্সিস সাহেব। মহারাজা

নন্দকুমার ছিলেন এই ফ্রান্সিস সাহেবের ইয়েসম্যান। ফ্রান্সিস সাহেব এই গ্রান্ডের স্ত্রী এই ফরাসি মহিলার প্রেমে পড়ে গেলেন। এই রকম উন্মত্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রেম সাধারণত দেখা যায় না। গ্রান্ডের অভিযোগ ছিল ফিলিপ ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে যে তিনি নাকি তাঁর অনুপস্থিতি কালে প্রায়ই লুকিয়ে ছদ্মবেশে মিসেস গ্রান্ডের কাছে যেতেন। আলিপুরের ভেলভেড়িয়ারে বসবাস করতেন মিস্টার ও মিসেস গ্রান্ড। গ্রান্ডের প্রাচীরঘেরা বাড়ির ফটকও বন্ধ থাকত বলে ফিলিপ ফ্রান্সিস রাত্রিবেলা একটি মই কাঁধে করে, কালো পোশাক পরে, চুপিসাড়ে প্রাচীর টপকে গ্রান্ডের বাড়িতে ঢুকতেন এবং মিসেস গ্রান্ডের ঘর পর্যন্ত হাজির হতেন। গ্রান্ডের চাকর-বাকররা ফ্রান্সিসকে নাকি একাধিকবার রাতে মিসেস গ্রান্ডের শয়নকক্ষ থেকে বেরুতে দেখেছে।

এই ঘটনা নিয়ে মামলা শুরু হয়েছিল ফিলিপ ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে। হিকি সাহেবকে অ্যাটনি নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন দু-পক্ষই। হিকি সাহেব কোনওপক্ষের হয়ে আদালতে দাঁড়াতে না চাওয়ায় অ্যাটর্নি টিলস্‌ম্যান দাঁড়িয়েছিলেন ফিলিপ ফ্রান্সিরের পক্ষে।

সাক্ষ্য-সাবুদ থেকে প্রমাণ হল ফিলিপ ফ্রান্সিস গ্রান্ড সাহেবের অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িতে মিসেস গ্রান্ডের কাছে রাতে যাতায়াত করতেন।

বিচারের সময় দেখা গেল—বিচারকদের মধ্যে ফ্রান্সিসের অবৈধ প্রেমের গুরুত্ব সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে।

তিন জন বিচারপতি মামলাটি শুনছিলেন। প্রধান বিচারপতি স্যার ইলিজা ইম্পি, জাস্টিস হাইড এবং স্যার রবার্ট চেম্বার্স। জাস্টিস হাইড বললেন—অপরাধটিকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। ফ্রান্সিস অপরাধ করেছেন। সেই জন্য তাঁকে দণ্ড দেওয়া হোক। স্যার চেম্বার্স হাইডের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করলেন না। তিনি স্যার চেম্বার্স ছিলেন আইনের প্রজ্ঞা। তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বললেন,—ফ্রান্সিস ও মিসেস গান্ডের প্রেম আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ হতে পারে না। অবশেষে স্যার ইলিজা ইম্পে রায়দান করে বলেছিলেন, এই অবৈধ প্রেমের অপরাধ বিচারের জন্য স্যার রবার্টের মতন আইন-বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। জাস্টিস হাইডের সঙ্গে তিনি সহমত প্রকাশ করে তিনি ফিলিপ ফ্রান্সিসকে দোষী সাব্যস্ত করছেন। অবশ্য জরিমানার অঙ্কটা স্যার ইলিজাইম্পের মধ্যস্থতায় কমে গিয়েছিল। জরিমানা হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। তখনকার দিনে—'সিক্কা টাকা'।

বিচারের সাত দিনের মধ্যে ফ্রান্সিসের অ্যাটর্নি টিলস্‌ম্যান ইংল্যান্ডে আপিল

করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে এসে তাঁর মক্কেলের হয়ে বক্তব্য পেশ করলেন। স্যার রবার্ট আগে যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন, সেই সূত্র ধরেই বক্তব্য রেখেছিলেন টিল্‌সম্যান। বক্তব্য শুনে স্যার ইলিজা ইম্পে বলেছিলেন, এই সব বক্তব্য তো আমরা স্যার রবার্টের কাছ থেকেই শুনেছি—এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। এই সময় নাকি ফ্রান্সিসের কাছ থেকে তিন লাইন লেখা এক টুকরো কাগজ এসেছিল টিল্‌সম্যানের হাতে, টুকরো কাগজটি হাতে পাওয়ার পর আপিলের আবেদন তুলে নেওয়া হয়েছিল।

পরে নাকি জানা গিয়েছিল গ্রান্ড নাকি জরিমানাটা আধাআধিতে রফা করে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়েছিলেন।

ফিলিপ ফ্রান্সিস এই ধরনের ঘটনা আর ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে চাননি সবদিক বিচার-বিবেচনা করে। এখানেই সমাপ্ত হল এই অবৈধ প্রেমের কাহিনী।

আদালতের মামলা শেষ হলেও এই রোমান্টিক প্রেমের ব্যাপার নিয়ে কলকাতার সাহেব মহলে সোরগোল পড়ে গিয়েছিল।

ব্রেকফাস্টে, ডিনারে, ট্যাভার্নে, কফি হাইসে, হোটেলে, বাড়িতে, পালকিতে, ফিটনে, ঘোড়ার পিঠে বেড়াতে বেড়াতে, সর্বত্র সর্বদা ফ্রান্সিসের রোমান্স সকলের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল।

কবি, কাব্যরসিক, ছড়াকাররা শুরু করে দিলেন কবিতা লেখা, ছড়া লেখা ফিলিপ ফ্রান্সিসের রোমান্সকে কেন্দ্র করে।

এই দেশেই ফরাসি রমণীর রোমান্স আবদ্ধ থাকল না। ফ্রান্সের এই রোমান্সের খবর পৌঁছে গিয়েছিল।

কলকাতায় এই ঘটনা নিয়ে এত কৌতুক সৃষ্টি হয়েছিল যে লজ্জায় ও মনের দুঃখে মিসেস গ্রান্ড কলকাতা ছেড়ে প্যারিসে চলে গিয়েছিলেন।

সেখানেও প্রসিদ্ধ তালিরান্দ মিসেস গ্রান্ডের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রেমে পড়লেন এবং শেষে তাঁকে বিয়েও করেছিলেন।

ফিলিপ ফ্রান্সিস ও মিসেস গ্রান্ডকে নিয়ে লেখা হয়েছিল একাধিক কবিতা। তার মধ্য থেকে একটি কবিতার কিছু অংশ তুলে ধরা হচ্ছে,—

Psha ! What a Fuss, twiset SHEE
and twiset her!
What abuse of a dear little Creature,
A GRAND and a mighty affair to be sure,
Just to give a light PHILIP (fillip) to
nature,

How Can you, ye prudes,
blame a lucious young wench,
Who so fond is of Love and romances,
Whose customs and manners are tout
a tail French
For admiring whatever from FRANCE-Is".

তদানীন্তন কালেও হাস্য-কৌতুকের অভাব ছিল না সাহেব-সুবাদের নিয়ে। লর্ড ক্লাইভও মহিলাপ্রীতিতে ভুগতেন। তাঁর প্রিয়পাত্র মহারাজা নবকৃষ্ণর ছিল দশটি স্ত্রী। এ ছাড়াও একাধিক মহিলার কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল। মহিলা সংক্রান্ত ব্যাপারে হেস্টিংসও কি খুব মুক্ত ছিলেন? নবাবমহলে ও ইংরেজ প্রশাসক মহলে মণিবেগমকে নিয়েও কি খুব কম কৌতুক হয়েছে?

তদানীন্তন কালের অনেক প্রেমের কাহিনী থেকে গিয়েছে অজানা। সেটাই বোধহয় স্বাভাবিক।

নয়

মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে প্রহসনের বিচার হয়েছিল ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে। কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া কলকতায় প্রথম ব্রাহ্মণের ফাঁসি।

ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ও ব্রাহ্মণ সন্তান ছিল। তার বিরুদ্ধে প্রহসনের বিচার হয়েছে সেই কথা নিন্দুকও বলতে পারবে না। প্রাণদণ্ডের আদেশ না দিয়ে তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া যেত কিনা তা অবশ্য আদালতের বিবেচ্য ছিল। ফাঁসির ব্যবস্থা তো এখনও ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনে আছে। তাহলে যতদিন ফাঁসির বিধান উঠে না যাচ্ছে, ততদিন বিশেষ ক্ষেত্রে **rare of the rarest** case-এ ফাঁসির আদেশ দিতে বাধা কোথায়? অনেকেই জানেন না মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট একাধিক নজিরে বলেছেন, **rare of the rarest case**-এ অপরাধ বিবেচনা করে আপরাধীকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া যেতে পারে।

বর্তমানের মানবাধিকার আইনের কোনও ধারায় বলা নেই—নৃশংস হত্যায় আদালত অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিতে পারবেন না। যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বর্তাবে এমন বিধান এখন পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। সাধারণ সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামি ১৪ বছর বন্দি জীবন কাটিয়ে বাইরে বেড়িয়ে আসছে। বর্তমানে জেলের নাম হয়েছে সংশোধনাগার। অবশ্য মৃত্যুদণ্ডের আসামিকে যদি কনডেমড সেলে রেখে ফাঁসিই দেওয়া হয় তবে তার কাছে জেলকে সংশোধনাগার বলা না বলা একই ব্যাপার।

জেলকে সংশোধনাগার নামে অভিহিত করলেই হবে? আইনের পরিকাঠামো ও জেলের বিধান (জেল কোড) আমূল পরিবর্তন করতে হবে। পঞ্চান্ন বছরের স্বাধীন ভারতেই আইনের পরিকাঠামো পালটালো কেন? কোম্পানি আমলে একটি বিচারের কাহিনী পাঠক-পাঠিকার কাছে তুলে ধরা হচ্ছে যার থেকে বোঝা যাবে বিচারের নামে কী রকম প্রহসন হত।

২ জুন, ১৭৬০। নন্দকুমারের ফাঁসির ১৫ বছর আগের ঘটনা।

সেও ছিল চ্যাটার্জি সম্ভবত তার নাম ছিল বেচারাম। পুরো নাম বেচারাম

চট্টোপাধ্যায়। বেচারাম চ্যাটার্জি নতুন ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লা তৈরি করার সময় দেখেছিল, জনৈক ক্যাপ্টেন ইঞ্জিনিয়ার অন্যায়ভাবে দু-হাতে টাকা চুরি করছিলেন, সেই খবরটা সে ইংরেজ কর্তাদের জানিয়ে দেয়। শুরু হল বেচারামের অভিযোগে মামলা। কিন্তু মামলার সাক্ষ্য-সাবুদ আরম্ভ হওয়ার আগেই ক্যাপ্টেন ইঞ্জিনিয়ারটি মারা গেলেন। বেচারামকে আদালত নির্দিষ্ট দিনে ডেকে পাঠালেন। সেই সঙ্গে অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারটির ছেলে বার্টনকেও ডাকা হয়। বিচারকক্ষে বেচারাম হাজির, আদালতের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বার্টন বেচারামের ওপর রাগে ফুলছে। বেচারাম বার্টনের রক্তচক্ষু দেখে ভয়ে কাঁপছিল। রাগের কারণ বেচারামের অভিযোগে তার বাবাকে কোর্ট নির্মাণের কাজ থেকে অপসারিত করা।

বেচারাম যখন ভয়ে কাঁপছে তখন একটি কাণ্ড ঘটে গেল। রাগে গজগজ করা বার্টন হঠাৎ একলাফে বেচারামের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। বার্টনের সঙ্গে কয়েক জন বেয়ারাও ছিল।

সেই সঙ্গী বেয়ারাদের সাহায্যে বার্টন বেচারামের হাত-পা বেঁধে ফেলল। এর পর বাঁশের ডগায় তাকে তুলে ঘোরানোর মতো করে বনবন করে ঘোরাতে লাগল। বেচারামের চিৎকারে সভাকক্ষের হতভম্ব বিচারকরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। বিচারকরা কিছুই করতে পারলেন না। ঘূর্ণিপাকের পর বেচারামকে চ্যাংদোলা করে নামিয়ে বার্টন নিজের হাতে নির্মমভাবে মারতে লাগল চাবুকের সাহায্যে।

বেচারাম চ্যাটার্জির ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে বার্টনের টনটনে জ্ঞান ছিল। চাবুক মারার পর ইংরেজনন্দন এই কুলীন ব্রাহ্মনটিকে চিৎ করে ফেলে, বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসে, জোর করে তার মুখে গোমাংস গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

এই ব্যাপারে সভার বিবরণীতে লেখা হয়েছিল—এত অত্যাচার সত্ত্বেও বেচারামকে নিজের পক্ষে একটি কথা বলার সুযোগও দেওয়া হল না।

হলওয়েস সাহেব নিজে ব্যাপারটি অতি অন্যায় বলে মনে করে বার্টনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সে কেন এমন ব্যবহার করল বেচারাম চাটার্জির ওপর। বার্টন কোনও কৈফিয়ৎ না দিয়ে শুধু বলেছিল বেচারাম একজন স্পাই। তাই তাকে এরকমভাবে শাস্তি দেওয়াতে কোনও অন্যায় হয়নি।

এই রকম ছিল বিচারের মানদণ্ড, এ যুগে বিচারালয়ে এই ধরনের ঘটনা কি ভাবা যায়?

বিচারের মানদণ্ড নিশ্চয়ই পরিবর্তন হয়েছে। পুরোনো ব্যবস্থা অনুসরণ করলে সাধারণ মানুষের সামনে রাস্তার চৌমাথায় ফাঁসির মঞ্চ বানিয়ে প্রাণদণ্ডের আসামিকে ফাঁসি দেওয়া হত।

ফাঁসির মঞ্চে অপরাধীকে তোলার পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলতেন—দণ্ডিত আসামিকে 'লটকাইয়া দাও'।

সেই ব্যবস্থা বহাল থাকলে—ফাঁসুরে নাটা মল্লিকরা নিওন লাইটের তলায় জনসাধারণের সামনে দাঁড়িয়ে কি বলতে পারত ধনঞ্জয়ের ফাঁসির আদেশ সঠিক না বেঠিক।

সে যাই হোক—ধনঞ্জয়ের কাছে এই প্রজন্ম কৃতজ্ঞ—তার ফাঁসি নিয়ে এত হইচই—নন্দকুমারদের বহুকাল পর উঠে আসার সুযোগ করে দিল।

সুযোগ করে দিল স্মরণ করে দিতে—সেই সব বিপ্লবী বীরদের যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে বিদেশিদের অগ্নিরোষে পড়েছিলেন। তাঁদের অনেককেই ফাঁসির মঞ্চে উঠতে হয়েছিল।

ফাঁসির আদেশ পেয়ে তাঁরা কেউ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েননি, তাঁরা যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁরা তো চাননি ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে। ওরা তো কেবল দিয়েই গেলেন, পেলেন না কিছুই। এঁরা প্রত্যেকেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, ফাঁসির দড়ি নিজের হাতে গলায় পরেছেন, কিন্তু ধনঞ্জয় সে তো নিজেই একজন অন্যায়কারী।

একটি সংবাদপত্রে দেখেছিলাম বিচারের সময় দায়রা আদালতে যে শ্রদ্ধেয় আইনজীবী ধনঞ্জয়ের হয়ে লড়াই করেছিলেন, তিনিও নাকি ধনঞ্জয়ের ফাঁসির ঠিক আগে ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করে বলেছিলেন, ধনঞ্জয়ের অপরাধের গুরুত্ব বিচার করলে প্রাণদণ্ডের আদেশ অযৌক্তিক হয়নি। অবশ্য সংবাদপত্রের এই সংবাদ সত্য কি না তা বলা সম্ভব নয়।

বিচারের ধারা যুগে যুগে পালটায় শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড, চৌরাস্তার মোড়ে ফাঁসির মঞ্চ বানিয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি কি বর্তমান যুগে ভাবা যায়!

কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে দণ্ডাদেশের আদেশ দিতেন আজকালকার দেশের মানুষই-বা তার কতটুকু খোঁজখবর রাখেন!

মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি নিয়ে ইতিহাসের পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখে পড়েছিল একটি স্ত্রীলোকের ফাঁসির কাহিনী।

১৮০০ সাল। কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের এক গৃহিণী অল্পবয়সের একটি বালিকা চাকরাণীকে হত্যা করার অপরাধে কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট বাড়ির গৃহিণীটিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

প্রকাশ্যে কলকাতার এক চৌরাস্তার মোড়ে তাকে নির্দিষ্ট দিনে ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যথাসময়ে ফাঁসির মঞ্চের চারদিকে বহুলোকের ভিড় জমে।

প্রাণদণ্ডের মহিলা আসামীটি এক গ্লাস জল খেয়ে, সমবেত জনতার দিকে চেয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেওয়ার পর সকলের দিকে হাত জোড় করে প্রণাম জানিয়ে চিরবিদায় নেন।

আইনের জার্নালে ইংরেজিতে এইভাবে লেখা হয়েছিল,

"Having drunk a cup of water, she addressed a few words to the multitude and made a Salam as a final adiew to this world."

ব্রজমোহন দত্ত নামে এক ব্যক্তিকে এক সাহেবের বাড়ি থেকে একটি ঘড়ি চুরি করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

লালবাজারের চৌরাস্তার মোড়ে তাকেও ওই একই পদ্ধতিতে ফাঁসি দেওয়া হয়। ব্রজমোহন উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে সেলাম জানিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলেছিল, 'সাহেব তৈয়ার।'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ফাঁসুড়েকে বলেছিলেন,—'লটকাইয়া দাও।'

নবযুগের নতুন মানবতাবোধ তখন ইংরেজের মনে সামান্যতম জাগেনি। এখন বললে বোধহয় আদালত অবমাননার দায়ে পড়তে হবে না, অত্যাচারী স্বার্থান্বেষী ইংরেজ বণিক—শাসকদের মতোই ছিলেন সেদিনের ইংরেজ বিচারকরা।

ধনঞ্জয় পুরোনো আমলের কত ফাঁসির আদেশের কথা মনে করিয়ে দিল তা বলে বোধহয় শেষ করা যাবে না।

প্রাণদণ্ডের আদেশ থাকা না থাকা নিয়ে চলুক তর্ক-বিতর্ক। একটা সমাধানও হোক এই বিষয়ে এই স্বাধীন ভারতবর্ষে।

ফাঁসি নিয়ে অত্যধিক সংবাদ পরিবেশন যেন শিশু মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে।

১৯০৪ সালের ২২ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিটির লেখক ছিলেন জনৈক কাশীনাথ কংসবণিক।

বিধিটির হেডিং ছিল—(নিবন্ধ)

নাটার ব্যবসা

'দড়িটা চাই-ই, নাটা নাছোড়'—'কলকাতা'য় (১৪ আগস্ট) প্রকাশিত সংবাদটি পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম ফাঁসুড়ে নাটা মল্লিক ধনঞ্জয়ের ফাঁসির

দড়িটি টুকরো টুকরো করে কেটে তাবিজ কবচ বানিয়ে বিক্রি করবেন। এই তাবিজ পরলে নাকি বহু রোগ সেরে যায়। কিন্তু নাটাবাবুকে আমার প্রশ্ন, ফাঁসির দড়ির টুকরো দিয়ে তৈরি তাবিজ-কবচই যদি রোগ সারাতে পারে, তাহলে আপনি কেন দেহের যন্ত্রণা কমাতে আপনারই পাড়ার ওষুধের দোকান থেকে নিয়মিত ওষুধ কিনে খান? খান, কারণ—যন্ত্রণামুক্তির জন্য ওই ওষুধই আপনার একমাত্র ভরসা। তাবিজ-কবচে যে রোগ সারে না, তা আপনিও ভালো জানেন। অতএব নাটাবাবু, ফাঁসির দড়ির তাবিজ নিয়ে ধাপ্পাবাজির ব্যবসা করবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সালে প্রণীত 'দ্য ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস' (অবজেকশনেবল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট) অ্যাক্ট অনুযায়ী তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবচ বিক্রি ইত্যাদি পেশা হল অনৈতিক, অবাঞ্ছিত, সভ্যতার পরিপন্থী। নাটাবাবু যে ব্যবসা করবেন ভাবছেন, তা দণ্ডণীয় অপরাধ। প্রশাসন সজাগ হোক।

(১৪ আগস্টের সংবাদটি কী ছিল তা অবশ্য বলা সম্ভব নয়)। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ফাঁসুড়ে নাটা হয়েছে নাটাবাবু। হয়েছে মঞ্চের বক্তা, প্রধান অতিথি হয়ে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধক বেরিয়েছে নাটা—থুড়ি নাটাবাবুর পারিবারিক ইতিহাস এবং ধনঞ্জয়ের ফাঁসির ন্যায্যতা অন্যায্যতা নিয়ে তার মত প্রকাশ।

টিভি সেটের সামনে বসে শুধু বক্তৃতাই দেয়নি—গান শুনিয়েছে।

ধনঞ্জয়ের ফাঁসি—নাটা মল্লিকের উত্থান।

ইংল্যান্ডের বিচারপ্রণালী অনুসরণ করে কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট ১৭৭৫ সালের ৫ মার্চ মহারাজা নন্দকুমারকে জালিয়াতির অভিযোগে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেও সেই বিচার-প্রহসনের বিচার হলেও শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু ইংরেজদের বিচারের প্রশংসা করেছিলেন।

লোকমতের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, "মানুষ যদি নিষ্পাপ ও স্থিরবুদ্ধি হইত, বিচার সম্বন্ধে লোকমতের স্বাধীনতা আবশ্যিক হইত না। কিন্তু মানুষের মন চঞ্চল, তাহার চিত্ত কামনা ও রাগদ্বেষ প্রবল, তাহার বুদ্ধি অশুদ্ধ ও পক্ষপাতপূর্ণ এই অবস্থায় বিচারের শুদ্ধতা রক্ষা করিবার তিন উপায় আছে।

প্রথম উপায়—আইনজ্ঞ, প্রৌঢ়, ধীর প্রকৃতি লোককে বিচারাসনে বসাইয়া তাহাদিগকে সর্বপ্রকার প্রলোভন, ভয়প্রদর্শন, স্বার্থচিন্তা, পরের আদেশ, প্রার্থনা, অনুনয় ইত্যাদি হইতে দূরে রাখা, চঞ্চলমনা, আইনে অনভিজ্ঞ যুবককে কখনও বিচারাসনে আরূঢ় করা উচিত নহে। বিচারককে কোনও মতে শাসকের অধীন করাও বিপজ্জনক, এই তত্ত্ব ও নিয়ম ইংল্যান্ডীয় বিচারপ্রণালীতে সম্পূর্ণ রক্ষিত

হইয়াছে বলিয়া ব্রিটিশ বিচারপ্রণালীর এত প্রশংসা।

দ্বিতীয় উপায়—বিচারের মহান নিষ্কলঙ্ক আদর্শ স্থাপন করিয়া সেই আদর্শ বিচারক, আইন ব্যবসায়ী লোক ও সর্বসাধারণের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করা। কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট হওয়া মানুষের পক্ষে অতি সহজ, সেই জন্য লোকমাতাকে আদর্শের রক্ষকরূপে দাঁড় করানো ভালো। বিচারক যদি জানেন যে, আদর্শ হইতে লেশমাত্র ভ্রষ্ট হইলে লোকের নিন্দা ও কলঙ্কের পাত্র হইবে, তাঁহার মনে অন্যায় করিবার প্রবৃত্তি সহজে পাইবে না?

শ্রীঅরবিন্দ ১৩১৬ সালে লিখেছিলেন—"আমাদের দেশে কয়েকটি কারণবশত বিচারককে শাসনের অধীন রাখা হইয়াছে। সেই জন্য বিচারকের দায়িত্ব অনেকটা শাসকের অধীনে শাসকের উপর পড়িয়াছে। বিচারক ঈশ্বরের প্রতিনিধি হন। অতএব শাসকের দায়িত্ব অতি গুরুতর। ইহার উপর শাসনতন্ত্রের সুবিধার জন্য অপক্বকেশ অনভিজ্ঞ লোকের উপরেও বিচারের ভার দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। আবার সম্পত্তি নতুন আইনে বিচারকের বিচার সম্বন্ধে বিপরীত লোকমত ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইসব ব্যবস্থা শাসনের জন্য আবশ্যক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব ইহার সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। কিন্তু এই অবস্থায় শাসকের কী ভীষণ দায়িত্ব, তাহা শাসনকর্তারা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাহারা যেন স্মরণ করেন যে, তাঁহার এই অপূর্ব ক্ষমতার কী প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা ভগবান দেখিতেছেন, দেশের হিতাহিত, রাজ্যশাসনের ফলাফল এবং সাম্রাজ্যের সুখ-শান্তি ও স্থায়িত্ব তাহারই উপর নির্ভর করে।

কোম্পানির আমলে বিচারালয় যে শাসকের ইচ্ছানুযায়ী চলত তা বোঝা যায় শ্রীঅরবিন্দর গভীর মন্তব্য থেকে। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনে কি ক্ষেত্র বিশেষে বিচারকের আদেশ প্রহসন বলে পরিগণিত করা যাবে না?

কলকাতার অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে মামলায় সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ১৯৩৫ সালের 'ভারতরক্ষা আইনে'র ৩৮(১) এ ও ৩৮ (৫) ধারানুযায়ী মামলা চলাকালীন অবস্থায় অসুস্থতাবশত হাজির না হওয়ায় সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ হয়। সেই অনুযায়ী ব্রাঞ্চের পুলিশ ইনস্‌পেক্টার ১০.৩.১৯৪১-এ সুভাষচন্দ্রের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব আদালতে দাখিল করেন।

চিফ প্রেসিডেন্সি কোর্টে মামলার নং ছিল সি-২৯/১৯৪০ সাল। ইংরেজ সরকারের আবেদনটি ছিল এরকম—

এম্পারার বনাম সুভাষচন্দ্র বোস।

Sir,

In praying for order of attachment of the properties of the proclaimed offender named above, I hang the honour to report that the said offender has got the following moveable and immoveable properties in Calcutta.

অস্থাবর সম্পত্তি—

(১) সুভাষচন্দ্র বোস সুভাষ পার্স কমিটির লেনদেনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এই কমিটির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে কলকাতার কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে অবস্থিত বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে। সেখানে কমিটির নামে হিসাব বহির্ভূত ২৫৭ টাকা।

(২) ১০০ নং ক্লাইভ স্ট্রিটে অবস্থিত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় রয়েছে সুভাষের নামে হিসাববহির্ভূত ২০ টাকা ১৫ আনা।

(৩) ৪ নং ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিটে অবস্থিত কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে সুভাষের নামে ৩৯ টাকা ৬০ পয়সা হিসাব বহির্ভূত অবস্থায় রয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তি

(১) কলকাতার ভবানীপুরের ৩৮/২, এলগিন রোডের বসতবাড়ির এক চতুর্থাংশের অংশীদার হলেন সুভাষ। অপর তিন অংশীদার হলেন সতীশচন্দ্র বোস, সুধীরচন্দ্র এবং শৈলেশচন্দ্র বোস।

এরপর বলা হয়েছিল উপরোক্ত বসতবাড়িটি কলকাতার ৭৭বি, নিউ থিয়েটার রোডের মিসেস মটুকা আব্রাহামের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে ১৪০০০ টাকার বিনিময়ে, বন্দকি বাড়িটি এখনও ছাড়ানো হয়নি।

(২) বর্তমানে সুভাষ বসবাস করছেন ১৬৬ নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে। সেখানে 'মহাজাতি সদন' নামে একটি বাড়ির কাজ চলছে। সুভাষচন্দ্রই জায়গাটি নিজে নিয়েছেন।

একদিন মামলায় অনুপস্থিতির কারণে সুভাষচন্দ্রের উপর বদলা নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের মাধ্যমে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়—ইংল্যান্ডের আদালতগুলিকে ইংরেজরা যেভাবে মর্যাদা দিতেন, ভারতের আদালতগুলিতে কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসন কখনওই নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে দেয়নি।

বিপ্লবী কালাচাঁদ সাহার বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কোনও গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য-সাবুদ ছিল না। তবুও প্রশাসনের কারসাজিতে ফাঁসির আদেশ বের করা হয়েছিল।

কালাচাঁদ সাহাও প্রাণভিক্ষা না চেয়ে হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি পরে নিলেন।

ফাঁসির বিচিত্র সব কাহিনী পাওয়া গেলেও নাটা মল্লিক ছাড়া সেভাবে আজ অবধি কারও নামই উঠে আসেনি। আসার কথাও নয়। 'ফাঁসি' একটা খবর, কিন্তু ফাঁসুড়ে কী খবর?

প্রহসনের বিচারে ফাঁসি হলে অবশ্যই জনগণকে সোচ্চার হতে হবে। কিন্তু আইনের নিক্তি ধরে বিচার করার পরে অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন করে বিচারক যদি ফাঁসির আদেশ দেন, তাহলে সেই ফাঁসি নিয়ে গল্পের গোরু গাছে উঠবে কেন?

মতিলাল মল্লিককেও অন্যায়ভাবে ফাঁসিতে লটকানো হয়েছিল। স্পেশাল ট্রাইবুনাল বে-আইনিভাবে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল। হাইকোর্টও কোনও যুক্তির ধার না ধরে ট্রাইবুনালের দেওয়া ফাঁসির আদেশ বহাল রেখেছিলেন।

কালাচাঁদ সাহা ও মতিলাল মল্লিকের ফাঁসির আদেশের যৌক্তিকতা বিচার-বিবেচনা করে ঐতিহাসিক কালীচরণ ঘোষ বলেছিলেন—"This was a mockery of Law ?

ইতিহাস গবেষকরা ফাঁসুরে নিয়ে কোনও দিন কোনও গবেষণা করেছেন কিনা জানা নেই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ফাঁসির আদেশের অনেক নথি আজও সযত্নে রাখা আছে। মহাফেজখানায়।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে গেল বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার ফাঁসির আদেশ । ১৯২৪ সালের ১২ জানুয়ারি ভীষণ কুয়াশা। বিপ্লবীরা চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন—কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করার। তিনি ভুল করে অন্য এক সাহেবকে গুলি করেছিলেন। পার্কস্ট্রিটের মোড়ে। তাঁর ফাঁসি হয়েছিল ১৯২৪ সালের ১ মার্চ।

অহিংস আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গোপীনাথের প্রশংসা করেছিলেন।

ফাঁসির মঞ্চের অকুতোভয় এই দেশপ্রেমিকদের কথা মনে হলেই মনে হয়—

"পৃথিবী ও ইতিহাস কাঁপে
আজ অসহ্য আবেগে
ওদের পায়ের স্পর্শ মাটিতে সোনার ধান
রং লাগে মেঘে।
এ আকাশ চন্দ্রাতপ, সূর্য আজ
ওদের পতাকা।

মুক্তির প্রচ্ছদপটে ওদের কাহিনী
আজ ঢাকা।"

বালেশ্বরে সংগ্রাম হয়েছিল ১৯১৫ সালে। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পূর্ণদাস ও মনোরঞ্জন সেন সশস্ত্র বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

চিত্তপ্রিয় নিহত হন ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর খরস্রোতা বুড়িবালামের তীরে। বাঘাযতীন তার পরের দিন মারা যান। মনোরঞ্জন বালেশ্বরের পুলিশ সুপারকে টেগার্ট মনে করে গুলি ছুঁড়েছিলেন। বাঘাযতীন মরার আগে জ্যোতিষ, নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনকে মুক্তির জন্য আকুতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও মূল্য দেয়নি ইংরেজ।

রাজদ্রোহিতার অভিযোগ করা হয়েছিল নীরেন্দ্র, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষচন্দ্রের বিরুদ্ধে। মামলায় মনোরঞ্জন ও নীরেন্দ্রনাথকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

সম্ভবত আপিলের পরে দণ্ডাদেশ বহাল থাকায় বালেশ্বর জেলেই এই দু'জন বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এদের ফাঁসুড়ে কে ছিল তার ইতিহাস চিরকালের মতো মুছে গিয়েছে। দেশবন্ধুও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—"Life is unbearable without—Swaraj.

এতসব ফাঁসিব কাহিনী যখন বিদ্যমান, প্রাণদণ্ডের আদেশ যদি অবাঞ্ছিত হয়, তাহলে স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পরেও প্রাণদণ্ড কেন তুলে দেওয়া হয়নি। তুলে দিলে ফাঁসি আর ফাঁসুড়ে নিয়ে আলোচনা, সংবাদ পরিবেশনও বন্ধ হবে।

তবে ফাঁসুড়ে আর ফাঁসের রশি নিয়ে যত কম আলোচনা করা যায় বোধহয় সমাজের ততই মঙ্গল।

মহারাজ নন্দকুমার আদর্শের জন্য ফাঁসিকাঠে চড়েননি ঠিকই, প্রহসনের বিচারে ও হেস্টিংসের ব্যক্তিগত স্বার্থে ঝুলেছিলেন সাধারণ মানুষের সামনে। ইংরেজের বিচারের প্রশংসা অনেকেই করেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রহসনের বিচারও কি তারা খুব কম করেছেন?

ফাঁসি নিয়ে আলোচনার ঝড় না বইলে বোধহয় নন্দকুমাররাও ফাঁসির মঞ্চের বিপ্লবীরা দীর্ঘকাল বাদে আবার উঠে আসতেন না।

লিখতে বসে মনে পড়ে যায়—নজরুলের অভিযান কবিতার লাইন। বিদ্রোহী কবি বোধহয় সশস্ত্র বিপ্লবীদের মনের ডাক শুনেছিলেন—

না হলে লিখবেন—

নতুন পথের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান।
উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ—
মানুষ মহীয়ান!
চারিদিকে আজ ভীরুর মেলা,
খেলবি কে আয় নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বইবি কে উজান?
পাতাল ফেড়ে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান।
সমরসাজের নাইরে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব
নাঙ্গা-আদুল গায়।
আসবে রণসজ্জা করে,
সেই আশায়ই রইলি সরে!
রাত পোহাবে প্রভাত হবে
গাইবে পাখি গান।
আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান।।
আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রাপথিক সব
এ উহারে হানছে আঘাত
করছে কলরব।
অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল ; চল আগে চল
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান!
উষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
'জয় নব উত্থান।'